ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা

ড রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা

ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

পাঠকের কাছে আবেদন

ইসলামে নারী সবার উপরে, গলার রগ মোটা করে মোয়াজিন মোল্লা মৌলবীরা জোর গলায় প্রচার করে থাকেন। ইসলামের নারী-পুরুষ ভাবেন সত্যি তো তাই? আল্লা তো ভালো কথাই বলেছেন। সত্যি কি তাই? না—! ইসলামের নারী কি গরু, ছাগল, ভেড়ার মত, বিক্রয়যোগ্য; প্রাণী নয়তো?কি বলে আল্লার হাদিস কোরান; একটু মিলিয়ে দেখুন; না? তারপর বিচার বিবেচনা করুন। এটাই আপনার পায়ের কাছে প্রার্থনা। বেহেস্তে কোন নারী যাবে না কেন?

ইতি—লেখক

কয়েকটি সাম্প্রতিক ঘটনা

অল্প কয়েকদিন আগে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫, আনন্দবাজার, বর্তমান সহ কোলকাতার প্রধান প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে একটা সংবাদ প্রকাশিত হয় যার সারমর্ম হল এই যে, নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধানতলা থানার কালোপুর গ্রামের বাসিন্দা আয়ুব আলি ও তার স্ত্রী জাহানারা বিবির মধ্যে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে মৌলবীরা তাদের দ্বিতীয়বার নিকায় বসতে বাধ্য করে। ঘটনার সূত্রপাত হয় বছর খানেক আগে। প্রায় দশ বছর আগে আয়ুব আলি ও জাহানারা বিবির বিবাহ হয়। গত ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসের এক সন্ধ্যাবেলা তাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে। ঝগড়ার সময় আয়ুব আলি তার স্ত্রীকে হুমকি দেয় এবং বলে, "এ রকম চলতে থাকলে আমি তোকে তালাক দেবো।" সেই গ্রামেরই এক কিশোর তাদের এই ঝগড়ার কিছু অংশবিশেষ শুনে রটিয়ে দেয় যে, আয়ুব আলি জাহানারাকে তালাক দিয়েছে। গ্রামের মৌলবী সঙ্গে সঙ্গে ফতোয়া জারী করে যে, আয়ুব ও জাহানারার তালাক হয়ে গেছে, তাই তারা আর একসঙ্গে ঘর করতে পারবেনা। জাহানারাকে বাপের বাড়ী চলে যেতে হবে এবং অন্য কাউকে বিয়ে করতে হবে। যদি সেই দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয় তবেই সে আবার আয়ুব আলির ঘরে ফিরে আসতে পারবে।

আয়ুব ও জাহানারা উপরোক্ত ফতোয়া মানতে রাজী না হলে মৌলবীর নির্দেশে গ্রামসুদ্ধ লোক তাদের একঘরে করে। আয়ুবকে মাঠে কাজ করতে দেওয়া হয় না ও মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হয় না। আয়ুবের মামা বরগুল মন্ডলের মুদি দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আয়ুব-জাহানারার ছেলেমেয়ের সঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধূলা বন্ধ করে দেয়। এইভাবে অনাহারে অর্ধাহারে এক বছর কাটাবার পর গ্রামের মৌলবীরা ফতোয়া দেয় যে, আয়ুব ও জাহানারাকে মসজিদে গিয়ে আল্লার কাছে দোয়া চাইতে হবে এবং সম্পূর্ণ নতুন করে বিয়ে করতে হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আয়ুব আলি ও জাহানারাকে এ প্রস্তাবে সম্মত হতে হয় এবং কয়েকদিন আগে তাদের পুনর্বিবাহ হয়।

যে শরীয়তি বিধানকে ভিত্তি করে মৌলবীরা আয়ুব-জাহানারা দম্পতির উপর প্রথমোক্ত ফতোয়া জারি করে তা হল কোরান শরীফের ২ নং সূরা (সুরা বকরা)-এর ২২৯ ও ২৩০ নং আয়াত। ঐ আয়াত দুটিতে বলা হচ্ছে, 'তালাক' (এখানে 'তালাক' শব্দের দ্বারা তিনবার তালাক বলে বর্জন বোঝাচ্ছে) দেবার পরে তাকে নিয়ম অনুযায়ী রাখতে পার অথবা সৎভাবে ত্যাগ করতে পার..." (২/২২৯)। "অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত না অন্য বক্তির সঙ্গে সে বিবাহিত হবে। তারপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে তবে তাদের পুনর্মিলনে কোন অপরাধ হবে না..." (২/২৩০)। George Sale উপরোক্ত আয়াত দুটির যে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন তা হল "Ye me divorce your wives twice; and then either retain them with humanity or dismiss them with kindness..." (2:229). "But if the husband divorce her a third time, she shall not be lawful for him again, until she marry another husband. But if he also divorce her, it shall be no crime in them if they return to each other, if they think they can observe the ordinance of Allah" (2:230).

উপরিউক্ত আয়াত দুটির উৎপত্তি সম্পর্কে শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন, 'তফসীর হোসেনী' থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হল, "পৌত্তলিকতার সময় স্ত্রী বর্জনের নির্দ্ধারিত সংখ্যা ছিল না। এক স্ত্রীকে দশবার বর্জন করিয়াও পুরুষ তাহাকে পুনর্বার প্রতিগ্রহণ করিতে পারিত। একদা একটি স্ত্রীলোক হজরতের সহধর্মিণী মহামান্যা আয়েশার নিকট আসিয়া আপন স্বামীর অত্যাচারের বিষয় এরূপ বর্ণনা করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে পুনঃপুনঃ বর্জন ও প্রতিগ্রহণ করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিতেছে। এই বিবরণ হজরতের কর্ণগোচর হইলে দুইবার মাত্র বর্জনবিধি প্রবচনের অভ্যুদয় হয়।" উপরন্তু শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে শাহ আবদুল কাদেরের যে টীকা দিয়েছেন তা হল—"নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পুরুষ ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারে। প্রথম বর্জনে এই বিধি। দ্বিতীয় বর্জনের পর পুনর্গ্রহণের বিধি নাই। তবে ব্যবস্থানুসারে স্ত্রীকে তাহার স্বত্ব প্রদান করিতে সক্ষম হইলে তাহাকে রাখিতে পারে। সেইরূপ গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

ইসলাম ধর্মমতে শুধু পুরুষেরই তালাক দেবার অধিকার আছে। তিনবার তালাক শব্দ উচ্চারণ করার সাথে সাথে, স্থান কাল নির্বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সে মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকর হয়। [M. Hidayatullah, Principles of Mahamdan Law (1981), Tripathy, p. 324] কোরানের ৪ নং সুরার ১২৮ নং আয়াতে বলা হচ্ছে, "কোন স্ত্রীলোক যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নাই, এবং মীমাংসাই কল্যাণকর।" বিক্ষিপ্তভাবে এই আয়াতটি পড়লে মনে হবে যেন আল্লা স্ত্রীলোককেও তালাকের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু আসল সত্য হল এই যে, মহম্মদ তাঁর সর্বাপেক্ষা বয়স্কা পত্নী বিবি সৌদাকে তালাক দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সেই উপলক্ষে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উপরন্তু ঐ আয়াতে যে আপোষ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে তার অর্থ বিচ্ছেদ নয়, পরন্তু স্বামীর প্রসন্নতা অর্জনের জন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু ত্যাগ স্বীকার করার কথাই বলা হচ্ছে। এইসময় মহম্মদের ছয়জন স্ত্রী ছিলেন এবং নবী প্রতিদিন পালা করে প্রত্যেক বিবির ঘরে রাত্রিযাপন করতেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে বিবি সৌদা তাঁর পালা বিবি আয়েশাকে দান করে আপোষ মীমাংসা করেন।

উপরিউক্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন পুরুষ যদি রাগের মাথায়, ঝগড়ার মধ্যে, তিনবার তালাক তালাক তালাক বলে তার স্ত্রীকে বর্জনও করে, তবে প্রথম দু'বারের মতো তা ক্ষমার যোগ্য। এর পর তারা ইচ্ছা করলে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সহবাস করতে পারে। কিন্তু তৃতীয়বার বর্জনের পর স্ত্রী অবৈধ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কোরানের (২/২৩০) আয়াত অনুযায়ী অন্য কোন পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে এবং এই দ্বিতীয় স্বামী তাকে বর্জন করলে বা তালাক দিলে আগের স্বামী আবার তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য উভয়েরই যদি পুনর্মিলনে মত থাকে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, উপরিউক্ত সংবাদে মৌলবীদের ফতোয়া ও শরীয়তি আইনের মধ্যে ফারাক রয়েছে। ঐ সংবাদে শুধু বলা হয়েছে যে, দশ বছর আগে আয়ুব আলি ও জাহানারার বিবাহ হয়, এবং ঐ দশ বছরের মধ্যে আয়ুব আলি তার স্ত্রীকে দুবার তালাক দিয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না। উপরন্তু যে সংবাদের উপর ভিত্তি করে মৌলবীরা ফতোয়া জারি করেছিল, তাও নির্ভরযোগ্য ছিল না। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, মৌলবীদের উপরিউক্ত ফতোয়া সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল কি না। অথবা ইসলামী আইন-কানুন সম্পর্কে মৌলবীদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল কিনা।

এ প্রসঙ্গে কিছুদিন আগের আর একটি খবরের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে। খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের কোন এক গ্রামের এক দরিদ্র গৃহবধূ ঐ গ্রামেরই এক মৌলবীর কু-প্রস্তাবে রাজী না হবার দরুন ঐ মৌলবী তাকে ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী ঐ গৃহবধূকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এ ব্যাপারে কোরান বলছে, "তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে অবরুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লা তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা না করেন" (৪/১৫)। এর পরবর্তী আয়াতে বলা হছে, "এবং তোমাদের মধ্যে যদি দুজন অস্বাভাবিকতা করে তবে উভয়কেই শাস্তি প্রদান কর, কিন্তু তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয়, তবে তাদের রেহাই দিবে—আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (৪/১৬) (এই আয়াতে "তোমাদের

মধ্যে দুজন" বলতে দুজন সমকামী পুরুষ না একজন নারী একজন পুরুষ, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে।)।

প্রকাশ্যে সাক্ষী রেখে কেউ কোনদিন ব্যভিচার করে না। এবং সেই ব্যভিচার যদি চারজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় তবে কখনও একজন অভিযুক্ত হতে পারবে না। কাজেই কোন চারজন সাক্ষী যদি মিলিতভাবে কোন একজনকে ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে তবে স্বাভবিকভাবে এটাই ধরে নিতে হবে যে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রাক্-ইসলামী আরবে কোন নারী ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে গৃহবন্দী করে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলা হত। কালক্রমে এই প্রথা এমন পর্যায়ে গেল যে, সতীসাধ্বী রমণীকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কৌশলে পরিণত হল। পরবর্তীকালে এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠে যায় এবং একজন কুমারী ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হলে একশ' ঘা বেত ও এক বছরের নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হত এবং একজন সধবা রমণীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে, কোরান দ্বারা চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ বাধ্যতামূলক হলে, ব্যভিচারের সাজা প্রায় উঠেই গেল। কারণ ব্যভিচারের সপক্ষে চারজন সাক্ষী যোগাড় করা নিতান্তই এক অসম্ভব কাজ। শুধুমাত্র নিজ মুখে ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করলেই সাজা দেওয়া সম্ভব হতে থাকল।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। নবীর মদিনা বাসকালে একদিন মাগের আসলামী নামে একজন লোক তাঁকে বলল যে, সে ব্যভিচার করেছে। নবী তার কথা শুনলেন এবং তার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার তাঁকে একই কথা বলল এবং নবী আগের মতোই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। লোকটি তৃতীয়বারও একই কথা বলল, কিন্তু চতুর্থবার বলার পর নবী তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার সাজা দিলেন। নবীর সহচররা তৎক্ষণাৎ তাকে নিকটবর্তী একটা মাঠে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলল। এখানে মুসলীম ভাষ্যকারদের মত হল, লোকটি চারবার তার অপরাধ স্বীকার করায় চারজন সাক্ষীর মত নেবার কাজ হল এবং সেই কারণে নবী তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার শাস্তি দিলেন। এখানে আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, নবী ব্যভিচারের সাজা হিসাবে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলারই পক্ষপাতী ছিলেন। মদিনা বাসকালে নবী যে কয়টি ব্যভিচারের বিচার করেছেন, তার সব ক্ষেত্রেই "রজম" বা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার সাজা দিয়েছেন। [মেয়েদের বেলায় তিনি কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রজম করতে বলতেন কারণ একবার রজম করতে শুরু করলে সে অবশ্যই দৌড়াদৌড়ি করবে এবং এতে তার বেশবাস অবিন্যস্ত হবার আশঙ্কা আছে।]

কাজেই চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্য না নিয়ে বাংলাদেশের উপরিউক্ত মৌলবী কী করে একজন গৃহবধূকে ব্যভিচারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করলেন তা অবাক হবার বিষয়। আরও অবাক হবার বিষয় হল এই যে, ঐ মৌলবী ব্যভিচারের সাজা হিসাবে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন কেমন করে। ইসলামী ধর্মশাস্ত্র মতে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেবার অধিকারী একমাত্র আল্লা। এ প্রসঙ্গে আবু হোরায়রা বর্ণনা করছেন, "একবার আল্লার রসুল দুজন মূর্তিপূজককে কোরেশ এর নাম করে বললেন যে, যদি তাদের ধরতে পারি তাহলে যেন পুড়িয়ে মেরে ফেলি। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করে বলে দিলেন, 'তাদের বরং তরোয়াল দিয়ে মাথাই কেটে ফেলো, আগুনে পুড়িও না, কারণ আগুনে পোড়াবার অধিকারী একমাত্র আল্লা।'" (বুখারী—১২১৯)। এইসব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে মুসলিম সমাজে নারীসমাজ, বিশেষ করে অশিক্ষিত গ্রাম্য রমণীরা কতটা নিরাপত্তাহীন।

যাই হোক, আয়ুব আলি ও জাহানারার প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে দুবার বর্জন করে তবে কোরানের (২/২২৯) আয়াত অনুযায়ী সে তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তৃতীয়বার বর্জনের পর তার আর সে অধিকার থাকে না। স্বামী যদি ফের তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে চায় তবে সেই স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে হবে এবং সেই পুরুষ তাকে তালাক দিলে বা বর্জন করলে তবেই সে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। এইরকম পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের প্রচলিত রীতি হল এই যে, টাকা পয়সার বিনিময়ে এক ব্যক্তিকে এক রাত্রের জন্য ধরে আনা হয় এবং তার সঙ্গে ঐ বর্জিত স্ত্রীর বিয়ে দেওয়া হয়। রাত্রি কাটাবার পর সকালবেলা ঐ ব্যক্তি চুক্তি অনুযায়ী ঐ রমণীকে তালাক দেয় এবং স্বামী তাকে পুনরায় বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে। এক রাত্রের জন্য নিযুক্ত ঐ ব্যক্তি মুসলিম সমাজে মুস্তাহেল নামে পরিচিত। যাতে

করে নিযুক্ত মুস্তাহেল ঐ রমণীর মনে কোন ছাপ ফেলতে না পারে, সেই কারণে যথাসম্ভব কদাকার, কুশ্রী একজন লোককেই মুস্তাহেল নিযুক্ত করা হয়। মুসলিম সমাজে এরকম বিবাহকে হিল্লা বিবাহ বলে।এবং শুধু বিয়ে দিলেই হবে না। অন্তত পক্ষে এক রাত্রি একসঙ্গে শয়ন করতে হবে।

উপরিউক্ত প্রথা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে W. Muir বলেন—"Many lovers or gallants cause less shame to a woman than one Mostahel. ...In order to regain his wife, a man hires (at no considerable rate) some peasants, whom he choses from the ugliest that can be found in the streets. ...A case is mentioned by tradition in which Mohammad himself insisted on co-habitation with another husband, before married life could be returned to, and in language which one may hope, prurient tradition has fabcricated for him. ...It must not be forgotten that, all the immorality of speech and action connected with this shameful institution and the outrage done to the female virtue (not necessarily for any fault of the wretched wife, but the passion and thoughtlessness of the husband himself) has solely out of the verse (2.230) quoted above." (Life of Mahomet, p. 337)—অর্থাৎ একজন মুস্তাহেলের সঙ্গে করার থেকে অনেক প্রেমিক ও উপপতি থাকাও একজন নারীর পক্ষে অনেক কম লজ্জাজনক ব্যাপার। ...বিবাহিত জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে স্বামী চাষীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে (বেশ চড়া দামে) ভাড়া করে নিয়ে আসে এবং তাদের মধ্য থেকে, রাস্তার ভিখারীর মতো, সর্বাপেক্ষা কদাকার কুৎসিৎ একজনকে পছন্দ করে।...একটি হাদিসে একটি ঘটনার বর্ণনা আছে যাতে মহম্মদ নিজে এক রমণীকে, নিজের স্বামীর কাছে ফিরে বিবাহিত জীবন শুরু করার আগে অন্য আরেকজন পুরুষের সঙ্গে ঘর করার পরামর্শ দিচ্ছেন। এই হাদিসটি হল—একদিন একজন তালাক প্রাপ্তা রমণী মহম্মদকে বলল যে, সে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে ঘর করতে চায়, কারণ তার নতুন স্বামী যেন কাপড়ের একটু আঁচল (অর্থাৎ যৌন ব্যাপারে দুর্বল)। মহম্মদ হাসলেন এবং বললেন, "না, তা তুমি পার না, যতক্ষণ না তোমার নতুন স্বামী তোমার মাধুর্য উপভোগ করছে এবং তুমি তার মাধুর্য উপভোগ করছ (সহি মুসলিম ৩৩৫৪)। এই হাদিসটির ভাষা ও অন্তর্নিহিত অশ্লীলতা থেকে যে কেউ সহজেই ভুল করে বলতে পারেন যে, হাদিসটি জাল এবং মহম্মদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই তা বানানো হয়েছে।...এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এই লজ্জাজনক সামাজিক রীতির সঙ্গে যেসব কর্মকাণ্ড জড়িয়ে আছে এবং এসবের দ্বারা নারীত্বের প্রতি যে অত্যাচার করা হয় (যার জন্য সেই নারী বিন্দুমাত্র দায়ী নয়, দায়ী তার স্বামীর ক্রোধ ও বিচারবুদ্ধিহীনতা), এসব কিছুর একমাত্র উৎস হল কোরানের একটিমাত্র আয়াত (২/২৩০)।

কোরান নারীকে কতখানি মর্যাদা দিয়েছে

"হরফ প্রকাশনী" দ্বারা প্রকাশিত "হাদিশ শরীফ" গ্রন্থের লেখক জনাব রফিক উল্লাহ্ এক জায়গায় লিখছেন, "প্রকৃতপক্ষে নারীজাতির মর্যাদাদানই হল হজরত মহম্মদের প্রধান সংস্কারমূলক কর্মগুলির অন্যতম" (পৃ.৫০)। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্রসমূহ পড়লে মনে হয় যে, স্বয়ং আল্লা নারীজাতিকে মর্যাদাদানের ঘোরতর বিরোধী। তাই ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, সম্ভবত আল্লাপাকের ভয়ঙ্কর বিরোধিতার চাপে পড়ে নবী মহম্মদ নারীজাতিকে মর্যাদাদানের মহান দায়িত্ব খুব কমই পালন করতে পেরেছেন। মুসলিম সমাজে নারী কতখানি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিতা, তা খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠে যখন কোরানে আল্লা বলেন, "পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা একেকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর এ শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, পুরুষ নারীর জন্য ধন ব্যয় করে।কাজেই সাধ্বী নারী লোকচক্ষুর অন্তরালে আনুগত্য ও ইজ্জত রক্ষাকারিণী। আল্লার হেফাজতে তারা হেফাজত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং তাদের প্রহার কর"(৪/৩৪)।

উপরিউক্ত আয়াতে সর্বজ্ঞ আল্লা এটাই বলতে চাইছেন যে, পুরুষ নারীর কর্তা কারণ সে নারীর ভরণপোষণের জন্য টাকা খরচ করে। ঐ একই কারণে নারীর উচিত সতীসাধ্বী থাকা ও লোকচক্ষুর অন্তরালে ইজ্জৎ রক্ষা করা। কাজেই কোন নারী যদি আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয় বা তার ভরণপোষণের জন্য পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল হতে না হয় তবে, কোরান মতে, তার ইজ্জৎ রক্ষার প্রয়োজন নেই, সতীসাধ্বী থাকারও প্রয়োজন নেই। টাকা খরচ করে একজন পুরুষ অনেক কিছুর উপরই অধিকার অর্জন করতে পারে—যেমন গৃহপালিত পশু, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, ক্রীতদাসী, রক্ষিতা, বারবনিতা ইত্যাদি। কাজেই কোরান মতে, মুসলিম সমাজে নারীর স্থান এসবের থেকে বেশী মর্যাদাসম্পন্ন কি না তা সুধীজনেরা বিচার করবেন। এবং তাঁরা এটাও বিবেচনা করে দেখবেন যে, উপরিউক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লা নারীসমাজকে কতখানি মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন।

ইসলামে নারী কতখানি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিতা তা আরও প্রকটভাবে ফুটে ওঠে, যখন কোরানে আল্লা বলেন, "যদি তোমরা আশঙ্কা কর, তোমরা অনাথাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করতে পারবে না, তবে তোমাদের অভিরুচি অনুসারে দুই, তিন অথবা চারজন নারীর পাণিগ্রহণ করবে" (৪/৩)।

আল্লা এখানে সীমা বেঁধে দিচ্ছেন যে, চারজনের বেশী স্বাধীন নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সেরকম কোন সীমা টানছেন না এবং বলছেন, "দাসী ব্যতীত আর কোন (স্বাধীন) নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা বা অন্য কোন নারীর সঙ্গে পরিবর্তন করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাদের মুগ্ধ করে" (৩৩/৫২), "তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার উপর অধিকার অর্জন করেছে সেরূপ নারী (অর্থাৎ দাসী) ব্যতীত অন্য কোন সধবা নারী তোমাদের জন্য বৈধ নয়"(৪/২৪)। "যদি আশঙ্কা কর যে ন্যায় ব্যবহার করতে পারবে না তবে একজন (স্বাধীন) নারীকে বিবাহ করবে, অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার উপর অধিকারলাভ করেছে তাদের (পত্নীস্থলে) গ্রহণ করবে" (৪/৩)।

কাজেই একজন মুসলমান পয়সা খরচ করে যত খুশি সংখ্যক নারীর উপর প্রভুত্ব অর্জন করতে

পারে। পক্ষান্তরে নারী যদি সে অধিকারের বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটায়, তবে সে, কোরান অনুসারে তার উপর যথেচ্ছ শারীরিক নির্যাতন চালাতে পারে। এই প্রসঙ্গে গত ২০/৭/৯৪ তারিখের "বর্তমান" পত্রিকার একটি খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। ঐ খবর বলছে, "পাকিস্তানে বউ পেটানোর খবর এতদিন তেমন একটা শোনা যেত না। গত সপ্তাহে নিজের বউয়ের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাবার দায়ে এক বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার ৩০ বছরের জেল হয়। এই ঘটনার পর থেকেই একের পর এক বউ-পিটুনির খবর প্রকাশ হতে থাকে। দণ্ডপ্রাপ্ত ধর্মীয় নেতা, তথা মসজিদের ইমাম, হাফিজ শরীফ নিয়মিত তাঁর স্ত্রীর উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেন। জানা গেছে হাফিজ শরীফ তাঁর স্ত্রীকে উলঙ্গ করে যৌনাঙ্গে ইলেকট্রিক রড দিয়ে মারতেন।" এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রগতিশীল নারীসংগঠনের প্রধান, শাহনাজ বোখারি আশাপ্রকাশ করে বলেন, "হাফিজ শরীফের ৩০ বছরের জেল হওয়ায় অত্যাচারী স্বামীদের কিছুটা টনক নড়বে। এরা সংযত হবার চেষ্টা করবে। পাকিস্তানে মহিলাদের প্রতি পুরুষসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করবে এই ঘটনা।...সাধারণত পাকিস্তানে মহিলাদের খুন করে পুরুষরা পার পেয়ে যায়। এখানে গরু ছাগল বা মুরগীর মতোই মেয়েদের খুন করা হয়।"

উক্ত খবরে শাহনাজ বোখারি আরও বলেন, "পাকিস্তানে নারী-নির্যাতনের ঘটনা খুবই মারাত্মক হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র স্বামীরাই যে স্ত্রীদের উপর নিপীড়ন চালায় তাই নয়, ভাইরা বোনেদের উপর ও বাবারা মেয়েদের ওপরও নানা রকম নির্যাতন চালায়।" তিনি আরও বলেন, "গত এক মাসে তাঁর কাছে নারী নির্যাতনের ১৫টি ঘটনার খবর এসেছে। এরমধ্যে ১৩ জন মহিলা আমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা যান। বাকি দুজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন।"

কাজেই কোরান অনুসারে নারী হল পয়সা দিয়ে কেনা অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ। সুতরাং নারী যদি শিক্ষিতা হয়, বিশেষ করে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তবে এই সমস্ত ইসলামী অনুশাসন খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে। তাই তাকে পর্দাবৃত করে, গৃহবন্দী করে রাখতে হবে, যাতে সভ্যতার আলো তার কাছে না পৌঁছতে পারে। যাতে প্রয়োজনমতো যত জনকে খুশি বিয়ে করা যায় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে খুব সহজেই তালাক দিয়ে বিদায় করা যায়। নারীকে তাই পুরুষের লালসার শিকার ও ভোগের সামগ্রী হয়েই থাকতে হবে। কোরান মতে নারী হল পুরুষের শস্যক্ষেত্র, তাই তাতে যখন খুশি, যেভাবে খুশি গমন করা চলতে পারে (২/২২৩)। নবী মহম্মদ নারীজাতির আরও একটা প্রয়োজনীয়তার কথা বলে গেছেন। ঘরের স্ত্রী হল, যা চরিতার্থ করা সম্ভব নয় এমন অবৈধ কামনা ফেলার নর্দমা বিশেষ। নিজের পত্নী ছাড়া অন্য কোন নারীকে দেখে মনে কামের উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে তা নিজের স্ত্রীরূপ নর্দমা দিয়ে বইয়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। নবী একদিন মদিনার মসজিদে বসেছিলেন, এমন সময় একজন মহিলা তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। মহিলাকে দেখে মহম্মদের মনে কামের উদ্রেক হল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি পত্নী জয়নবের কাছে চলে গেলেন। জয়নব তখন চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিল এবং সেই অবস্থাতেই নবী তাঁর কাম চরিতার্থ করে ফিরে এলেন (মুসলিম-৩২৪০)। একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত আরব পণ্ডিত আল খজ্জালী এই কারণে আল্লাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে, আঠেরটি ব্যাপারে তিনি মেয়েদের শাস্তি দিয়ে পুরুষকে মহিমান্বিত করেছেন। আঠেরটি কারণ হল—(১) রজঃস্রাব, (২) সন্তান প্রসব, (৩) বিয়ের পর নিজের লোকজন ছেড়ে একজন অপরিচিতের সঙ্গে চলে যেতে হয়, (৪) গর্ভধারণ, (৫) নিজের শরীরের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই, (৬) কম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, (৭) অন্যের কাছ থেকে শুধু তালাক পায়, নিজেরা তালাক দিতে পারে না, (৮) পুরুষ চারটি স্ত্রী রাখতে পারে কিন্তু তারা একটির বেশি স্বামী রাখতে পারে না, (৯) তাদের গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হয়, (১০) বাড়ীর ভিতরেও তাদের মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়, (১১) আল্লা একজন পুরুষের সাক্ষ্যকে দুজন মেয়ের সাক্ষ্যের সমান করেছেন, (১২) নিকট আত্মীয়ের সাহচর্য ছাড়া সে বাড়ীর বাইরে যেতে পারে না, (১৩) শুধু ছেলেরাই জুম্মার জামাতে নামাজ ও ভোজে অংশ নিতে পারে, (১৪) মেয়েরা শাসক অথবা বিচারক হতে পারে না, (১৫) তারা মেধার হাজার ভাগের এক ভাগের অধিকারী কিন্তু পুরুষ নয় শত নিরানব্বই ভাগের অধিকারী, (১৬) কোন নারী যদি লম্পট হয় তবে শেষ বিচারের দিন তাকে অন্যের থেকে অর্ধেক যন্ত্রণা দেওয়া হবে, (১৭) স্বামী মারা গেলে পুনর্বিবাহের জন্য তাদের ৩ মাস অপেক্ষা করতে হয়, (১৮) স্বামী তালাক দিলেও পুনর্বিবাহের জন্য তাদের তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়। (Counsel forkings, Nasihat Al-Muluk, Univ. of Durhan Pub., London (1971), p.

164) ।

প্রাক্-ইসলামী আরব সমাজে নারীর স্থান

নারীর প্রতি ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গী আকাশ থেকে পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-ইসলামী আরব সমাজে নারীর যে স্থান ছিল, ইসলাম বা কোরানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র। জনাব রফিক উল্লাহ্‌র ভাষায়, "নারীজাতিকে তখন অস্থাবর সম্পত্তির মতোই ব্যবহার করা হত। কোন কিছুতেই তাদের কোন অধিকার ছিল না, না স্বামীতে, না স্বামীর ধন সম্পত্তিতে। প্রয়োজনে পুরুষ তাকে ব্যবহার করত, আবার দাসীর মতো তাড়িয়েও দিত" (হাদিশ শরীফ, পৃ. ৫১)। এই কথার দ্বারা রফিক উল্লাহ্ সাহেব এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলামের আগে আরবে নারী খুবই অবহেলিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলাম নারীকে যার পর নাই, মর্যাদাসম্পন্ন করেছে। কিন্তু যে ইসলাম চারজন স্বাধীন নারী ও যত খুশি সংখ্যক দাসী রক্ষিতার উপর অধিকার বৈধ ঘোষণা করে, যে ইসলাম তিনবার "তালাক" শব্দ উচ্চারণের দ্বারা, কোন খোরপোষের ব্যবস্থা না করেই নারীকে গৃহপালিত পশুর মতো রাস্তায় বের করে দেওয়াকে বৈধ ঘোষণা করে, যে ইসলাম অ-মুসলমান নারীকে লুঠের মাল বা গনিমতের মাল বলে ঘোষণা করে, তাকে ভোগ করা বৈধ ঘোষণা করে, সেই ইসলাম নারীজাতিকে কতখানি মর্যাদা সম্পন্ন করেছে তা সহজেই অনুমান করা চলে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মুসলমানকে এ কথা বলতেই হবে যে, ইসলামের আগে সবই খারাপ ছিল এবং ইসলামের পর থেকেই সব ভাল হয়েছে। অথবা ইসলাম বা কোরান যা বলছে তার থেকে ভালো আর কিছুই হতে পারে না। এ ছাড়া অন্য সব কিছুই খারাপ এবং পবিত্যাজ্য। তা না হলে সেই ব্যক্তির প্রাণসংশয় অনিবার্য।

বর্বর পশুপালক ইহুদী জাতির দ্বারা যে ধর্মমতের সূচনা হয়েছিল, আরবের পশুপালকদের দ্বারা তার কিছু রদ বদল হয়েই আজ তা ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে। কাজেই ইসলামের মধ্যেও সেই বর্বর পশুপালক আরবসমাজের রীতি-নীতি স্থান পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন আরবসমাজ ছিল যথেচ্ছ নারী সম্ভোগ ও যৌন স্বেচ্ছাচারের অবাধ লীলাক্ষেত্র। সঙ্গতি সম্পন্ন আরবরা অসংখ্য নারীকে দখলে রেখে বিশাল বিশাল হারেম তৈরী করতো। স্বাধীন নারী অপেক্ষা ক্রীতদাসীর ভরণপোষণের খরচ কম হবার দরুন, কম সঙ্গতিসম্পন্ন আরবরা দাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে হারেম ভর্তি করতো। প্রায়শই তারা অধিকারভুক্ত এই সমস্ত স্ত্রীদের অন্য পুরুষের কাছে ভাড়া খাটাতো অথবা নিজেদের মধ্যে স্ত্রী বিনিময় করত। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে এবং এর থেকে, ইসলাম নারীকে কতটা সম্মানিত করেছে, তারও অনুমান করা যেতে পারে। মহম্মদের এক অনুচর, আবদুর রহমান মক্কা থেকে হিজরৎ করে মদিনায় এলে ধর্মভাই সাদ্ বিন রাবী তাকে তার বাড়ীতে আশ্রয় দেয়। মক্কায় উক্ত আবদুর রহমানের ১৬ জন পত্নী ও বেশ কিছু সংখ্যক দাসী রক্ষিতা ছিল। যাই হোক, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব সমাপ্ত হলে সাদ তার দুই পত্নীকে ডেকে পাঠালেন এবং আবদুর রহমানকে বললেন, "আমার এই দুজন পত্নী আছে, এদের মধ্য থেকে যাকে খুশি পছন্দ করে নাও।" আবদুর রহমান একজনের প্রতি ইঙ্গিত করা মাত্র সাদ সেই পত্নীকে তৎক্ষণাৎ তালাক দিয়ে তার সাথে শুতে পাঠাল।(Life of Mahomet, W. Muir, Vol. II, p. 272)।

বিশাল বিশাল হারেম তৈরী করার ব্যাপারে বস্তুতপক্ষে নবী মহম্মদ ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীরাই

মুসলমানদের প্রেরণা। লন্ডনের Seerah Foundation দ্বারা প্রকাশিত "Mohammad Encyclopaedia" গ্রন্থ বলছে যে, মহম্মদের পূর্ববর্তী নবী হজরৎ সুলাইমান (বাইবেলের Solomon)-এর ১৭০০ পত্নী ও ৩০০ ক্রীতদাসী রক্ষিতা ছিল। হজরৎ দাউদ (বাইবেলের David)-এর ৭ পত্নী ও অসংখ্য দাসী রক্ষিতা ছিল এবং হজরৎ ইয়াকুব ও হজরৎ মুসা (বাইবেলের Jacob ও Moses)-এর ৪টি করে পত্নী ছিল। এই প্রসঙ্গে ক্রীতদাসী রক্ষিতাদের ব্যাপারটা সংক্ষেপে একটু বলে নেওয়া ভালো হবে। একজন দাসীকে শুধু তার প্রথম মনিবই বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারে। কিন্তু সেই প্রথম প্রভু তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করলে বা অন্য কারও কাছে বিক্রী করে দিলে সে তার স্ত্রীর মর্যাদা পাবার যোগ্য থাকে না। এর পর থেকে সে শুধু এক মনিবের থেকে আর এক মনিবের হাতে বদল হতে থাকে। যাইহোক, হজরৎ সুলাইমান যখন বৃদ্ধ অবস্থায় রোগ শয্যায় শয়ান, তখন পুরোহিতরা বিধান দিল যে, নবীকে গরম করার জন্য একজন অল্প বয়স্কা কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া দরকার। কাজেই সারা দেশ খুঁজে একজন সুন্দরী সুলক্ষণা কুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হল। উল্লিখিত গ্রন্থে নবী মহম্মদের ২২ জন পত্নীর নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৪ জন ছিল দাসী রক্ষিতা। এ ছাড়া আরও ৭ জন রমণীর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হয়েছিল কিন্তু কোন না কোন কারণে নিকাহ্ পর্যন্ত এগুতে পারেনি।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, আরবী শব্দ নিকা আমাদের বিবাহ শব্দের সমতুল নয়। আরবী 'নখ' বলতে বোঝায় নারীর গোপন অঙ্গ। নখ থেকেই নিকা শব্দ এসেছে এবং নিকা বলতে বোঝায় কোন নারীর গোপন অঙ্গের ওপর অধিকার অর্জন করা।

যাই হোক এইসব হারেমবন্দী নারীদের প্রতি তৎকালীন আরবরা যদি কোন কারণে বিরূপ হত, তবে পশুর মতোই তাদের তাড়িয়ে দিত। কোন স্ত্রীকে ত্যাগ করার ইচ্ছা হলে তারা আরও একটা বিচিত্র উপায় অবলম্বন করত। হঠাৎ একদিন তাকে মা বলে ডাকতে ও মায়ের প্রতি ছেলের মতো আচার-আচরণ করতে শুরু করত। অথবা বলতো "তোমার পিঠটা ঠিক আমার মায়ের মত।" পরে কোরান দ্বারা এই রীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (৩৩/৪)। কেউ মারা গেলে তার কোন বিধবা স্ত্রীর গায়ে কোন আত্মীয় যদি তার গায়ের জামাটা ছুঁড়ে মারতে পারত, তবে সেই বিধবার ওপর তার অধিকার জন্মে যেত। তখন সে সেই বিধবাকে ইচ্ছা করলে নিজের হারেমে ঢোকাতে পারত, কিংবা বিক্রী করে দিতে পারত কিংবা ভাড়া খাটাতে পারত। বিধবা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিয়ে করা তখনকার আরবদের মধ্যে একটা বৈধ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিধবা বিমাতাদের স্বাভাবিকভাবেই বিয়ে করা হয়ে যেত, কারণ বাবা মারা গেলে ছেলে তার অন্যান্য সম্পত্তির মতো হারেমেরও মালিক হত। প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে, বিধবা বিমাতার সঙ্গে সম্পর্ক করার মত জঘন্য কাজের জন্য পরবর্তী প্রজন্মই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কিন্তু ছেলের জন্যে কনে পছন্দ করতে গিয়ে ষাট বছরের বাবা সেই আঠারো বা কুড়ি বছরের মেয়েকে নিজেই তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষ করে ঘরে আনলেন, এরকম ঘটনা বর্তমান মুসলিম সমাজেও একেবারে ঘটে না বলা যায় না। সেক্ষেত্রে সেই ছেলে ও সেই বিমাতার মধ্যে যদি কোন গোপন সম্পর্ক গড়ে ওঠে তবে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না।

ইসলাম এসে এইসব হারেমবন্দী হতভাগিনীদের অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে বলে মনে হয় না। প্রাক্ ইসলামী যুগের আরবরা তাদের স্ত্রীদের সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগলে যে কোন প্রকার শাস্তি দেবার অধিকারী ছিল। ইসলামোত্তরযুগেও তার কিছু হেরফের হয়েছে বলা যায় না। কয়েকটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আফজল খাঁ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন তিনি তাঁর হারেমের ৬৩ জন বিবিকে কৎল করে যুদ্ধযাত্রা করেন। আফজলের মনে ভয় ছিল যে তিনি প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না। কাজেই তাঁর অবর্তমানে হারেমের বিবিরা অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী হবে এটা তাঁর সহ্য হল না। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে বিবি অবশ্যই পাওয়া যাবে। বেশীদিন আগের কথা নয়, এই বিংশ শতাব্দীতেই, উগান্ডার অধিপতি ইদি আমিনের হারেমে যে কতজন বিবি ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া মুশকিল। কারণ কিছুদিন পর পরই তিনি পুরানো বিবিদের কৎল করে হারেম সাফ করতেন এবং নতুন নতুন বিবি দিয়ে হারেম ভর্তি করতেন। কসাইখানার পশুর মত শৃঙ্খলিত সেইসব রোরুদ্যমান বিবিদের প্রাসাদ থেকে কৎলখানায় নিয়ে যাবার বিবরণ পড়লে গায়ের রক্ত হিম হবার উপক্রম হয়। পশ্চিমী সাংবাদিকদের মতে আমিন ঐ সব স্ত্রীদের মাংসের আস্বাদও

গ্রহণ করতেন। সেই ইদি আমিন যখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে সৌদি আরবে রাজনৈতিক আশ্রয় পাবার যোগ্য বিবেচিত হলেন, তা থেকে মনে হয়, এইসব কাজের দ্বারা তিনি আর যাই করুন না কেন, ইসলামের অমর্যাদা করেননি।

ইসলাম নারীজাতিকে কতখানি মর্যাদার আসনে বসিয়েছে তার আর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, স্বয়ং নবী মহম্মদ কর্তৃক পুরুষের অস্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী বিবাহের অনুমোদন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সমাজে বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তিমাত্র। যেহেতু যেকোন পত্নীকে যেকোন সময় তালাক দিয়ে বিদায় করা যায়, তাই সমস্ত বিবাহ ক্ষণস্থায়ী বিবাহে পর্যবসিত হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়, কারণ তালাকের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-চুক্তির মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। ইসলামী বিবাহচুক্তির কেন্দ্রবিন্দু হল দেনমোহর। বিবাহের সময় চুক্তি অনুযায়ী পাত্রীকে পাত্রপক্ষের তরফ থেকে কিছু অর্থ দিতে হয় এবং একেই বলে দেনমোহর। আজকাল আর সে অর্থ বিয়ের সময় দিতে হয় না, শুধু চুক্তিপত্রে লেখা থাকে। তবে স্বামী যদি কোনদিন সেই স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে আইনতঃ সে স্ত্রীকে ঐ অর্থ দিতে বাধ্য থাকে। তালাকের দ্বারা যে কোন সময় বিবাহচুক্তি ছিন্ন হবার সম্ভাবনা থাকার জন্য W. Muir ঐ দেনমোহরকে নিছক ভাড়া বলে গণ্য করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কিন্তু আলোচ্য ক্ষণস্থায়ী বিবাহের বিবাহ চুক্তিটাই ক্ষণস্থায়ী। কিছু বাস্তব কারণবশতঃ নবী মহম্মদ তাঁর অনুচরদের এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। যেমন দূরদেশে যুদ্ধাভিযান করার সময় সঙ্গীসাথীরা নারীসঙ্গহীনতার কথা ব্যক্ত করলে নবী মহম্মদ স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অনুমতি দান করেন। তবে তা অবশ্যই উপযুক্ত দেনমোহর প্রদান করে। নিদেনপক্ষে একটা জামা বা এক মুষ্টি খেজুড় বা এক মুষ্টি ময়দাও দেনমোহর হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। হুনাইন যুদ্ধের পর আউতাস যুদ্ধ পরিচালনার সময় মহম্মদ তাঁর উম্মতদের তিন রাত্রির জন্য ক্ষণস্থায়ী বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। শুধু হাদিসেই এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহের নির্দেশ আছে, কোরানে নেই। সম্ভবত এই কারণে পরবর্তীকালে তুরস্কের সুন্নী আলেমগণ এই ক্ষণস্থায়ী বিবাহ চুক্তিকে অবৈধ ঘোষণা করে, কিন্তু ইরান প্রভৃতি দেশের সিয়া শিবিরে যথারীতি চলতে থাকে।

ইসলামী স্বর্গ

ইসলামী স্বর্গে নারীজাতিকে যতখানি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে তার নজির আর কোথাও পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। বর্বর আরবজাতির কাছে নারী মাতৃজাতি নয়, শুধু ভোগের সামগ্রী। স্বাভাবিকভাবেই এই দৃষ্টিভঙ্গী কোরান তথা ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই যে স্বর্গে যাওয়া ইসলামের চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি, সেখানেও যথেচ্ছ নারী সম্ভোগের ছড়াছড়ি। ইসলামের আল্লা পুরুষ মানুষ, ফেরেস্তাগণ পুরুষ মানুষ এবং নবীগণও পুরুষ মানুষ। এই ভয়ঙ্কর পুরুষ শাসিত সমাজে, পুরুষরাই স্বর্গে গিয়ে অঢেল যৌনসুখ উপভোগ করবে। নারীর সেখানে প্রবেশ করারই অধিকার নেই। মহম্মদ বলতেন যে, নরকবাসীদের মধ্যে মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে এবং স্বর্গে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে। এর কারণ হল মেয়েরা স্বামীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। নবী বলতেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সব সমস্যারই মোটামুটি সমাধান করে গেছেন, শুধু নারী পুরুষের যে ক্ষতি করে তারই কিছু করে যেতে পারেননি। কারণ নারী তার এই বদগুণ, প্রথম মানবী "হাওয়া" (বাইবেলের ঈভ)এর কাছ থেকে পেয়েছে।

স্বর্গে আনত নয়না, সুডৌল বক্ষ ও ডিমের খোলার মতো মসৃণ ও গায়ের রং বিশিষ্ট স্বর্গীয় নারী বা হুরীর ছড়াছড়ি থাকবে। কে কতজন হুরী ভাগে পাবে সেব্যাপারে মতভেদ আছে। আবদুল্লা বিন ওমরের মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসীর ৫০০ হুরী, ৪০০ কুমারী এবং অন্য পুরুষের সাথে সহবাস করেছে এমন আরও ৬০০০ রমণী থাকবে। আল্লা প্রত্যেক স্বর্গবাসীকে এইসব রমণীদের সঙ্গে মিলিত হবার ক্ষমতা দেবেন। আবু হোরায়রার মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসী মুসলমানের একটা করে মুক্তার প্রাসাদ থাকবে, প্রত্যেক প্রাসাদে ৭০টা চুনীর বাড়ী থাকবে, প্রত্যেক বাড়ীতে ৭০টা করে মরকতের ঘর থাকবে, প্রত্যেক ঘরে ৭০টা আরামকেদারা থাকবে, প্রত্যেক আরাম কেদারায় ৭০টা করে বিভিন্ন রঙের কার্পেট থাকবে এবং প্রত্যেক কার্পেটে একজন করে হুরী বসে থাকবে। এছাড়াও প্রত্যেক ঘরে ৭০ জন করে দাসী থাকবে। এইসব হুরী ও দাসীরা যেসব পোষাক পরবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে। এছাড়া স্বর্গে থাকবে নারী কেনাবেচার হাট এবং সেখান থেকে স্বর্গবাসীরা পছন্দমতো নারী সংগ্রহ করতে পারবে। এইসব স্ত্রীদের সঙ্গে স্বর্গবাসীদের সঙ্গমকাল ৬০০ বছর স্থায়ী হবে। হুরীদের বয়স কখনও ১৬ (মতান্তরে ৩৩)-এর বেশী হবে না। [একজন স্বর্গবাসিনী কতজন করে স্বর্গীয় পুরুষ পাবেন এবং সে পুরুষরা কেমন হবে, এ ব্যাপারে ইসলামী শাস্ত্রে কোন আলোকপাত করা হয়নি।] সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবে, যে সমাজে নারীজাতির প্রতি বিন্দুমাত্র সম্ভ্রমবোধ নেই, যে সমাজে নারী শুধু বাজারের পণ্য, সে সমাজের পক্ষেই এ রকমের স্বর্গ কল্পনা করা সম্ভব। (অধিক জানতে হলে এই লেখকের 'অন্তিম গতি : আল্লার পতিতালয়' দ্রষ্টব্য।)

পর্দা সম্পর্কেদু-চার কথা

কিছুদিন আগে, আফগানিস্তানে নাজিবুল্লা সরকারের পতন ঘটলে নতুন যে ধর্মীয় সরকার শাসন ক্ষমতা দখল করে তারা শরীয়তি আইন চালু করার নামে সর্বপ্রথম যে কাজটি করে তা হল নারীসমাজকে বাধ্যতামূলকভাবে পর্দা দিয়ে আবৃত করা। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, ইসলাম বা কোরান মুসলিম নারীসমাজকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মুসলিম সমাজকে মধ্যযুগেই দাঁড় করিয়ে রাখতে চায়, অগ্রসর হতে দিতে চায় না। মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত দেশ এত দিন সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের পর তারাও ইসলামের জিগীর তুলে, শরীয়তি আইন-কানুন চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ ব্যাপারে গত ৮/৮/৯৪ তারিখের স্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকা খবর দিচ্ছে যে, উজবেকিস্তানের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী জনাব আবদুল গনি আবদুল্লা বলেছেন যে, তাসখন্দে ইসলামি ধর্ম ও আরবী ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করা হবে। কালক্রমে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় মধ্য এশিয়ায় ইসলামের স্তম্ভে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এটা বলাই বাহুল্য যে, এই সমস্ত ইসলামিকরণের প্রথম বলিই হবে ঐ সমস্ত দেশের নারীসমাজ। ইসলামিকরণের প্রথম অঙ্গ হিসাবে তাদের পর্দাবৃত করে গৃহবন্দী করা হবে এবং তিন তালাকে বিতাড়িত হবার অধিকারিণী করা হবে। পর্দার দৌলতে মুসলিম নারীসমাজের স্বাভাবিক চলাফেরা, শিক্ষাদীক্ষা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সর্বোপরি আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই পর্দার দাপটে সৌদি আরব, ইরান সহ মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের কোন খেলাধূলায় অংশ নেবার অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, মেয়েদের পক্ষে কোন খেলার মাঠে গিয়ে খেলা দেখাও নিষেধ। বাংলাদেশের কোন মেয়ের পক্ষে খোলা মাঠে খেলাধূলা করা নিষেধ, এমনকি, পুরুষ দর্শকের উপস্থিতিতে কোন ঘেরা জায়গাতেও তারা খেলাধূলা করতে পারে না।

বর্তমান ইরানে এই পর্দার দাপট যে কতখানি তা গত ৮/৮/৯৪ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকার একটা খবরের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। ঐ খবরে বলা হয়েছে যে, আয়াতুল্লা খোমইনীর আমলেই সেখানে মহিলাদের জন্য আলাদা বাস ও ট্যাক্সি চালু করা হয়েছিল এবং ইদানীং তাদের জন্য আলাদা ব্যাঙ্কও খোলা হয়েছে যেখানে শুধু মহিলা কর্মচারীই থাকবে। মেয়েদের জন্য পৃথক রেস্টুরেন্ট এবং সিনেমা হলেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সমস্ত কো-এডুকেশন স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং বিশেষভাবে ঘেরা জায়গায় মেয়েদের সমুদ্রস্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে (এই সমুদ্রস্নানও যথোপযুক্ত পোষাক আসাক পরেই করতে হবে)। দোকান ও হাট বাজারেরও সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যখন শুধু মেয়েরাই বেচাকেনা করতে পারবে। এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন ছেলে মেয়ের পক্ষে পথে ঘাটে কথাবার্তা বলা নিষেধ।পথে বেরোবার সময় তাদের এমন পোষাক পরতে হবে যাতে সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকে, শুধু প্রয়োজনে মুখমণ্ডলটি খোলা থাকতে পারে। মেয়েদের মাথার চুল অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে, কারণ তা বিপজ্জনক। বর্তমানে দেশ থেকে বহিষ্কৃত ইসলামী ইরানের প্রথম রাষ্ট্রপতি আবুল

হাসান বনিসদর ১৯৭৯ সালে এই দাবী করেন যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা নাকি প্রমাণিত হয়েছে যে, মেয়েদের চুল থেকে একরকমের অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় যা পুরুষদের উন্মত্ত করে তোলে। এব্যাপারে ইরানের বর্তমান কর্ণধার আলি খোমেইনীর মত হল, কোন মুসলমানের চাদরের নীচে মেয়েদের এক গাছি চুল থাকা ইসলামের প্রতি তাক করা ধারাল ছুরি বিশেষ। ইসলামী ইরানের সবথেকে বড় তাত্ত্বিক নেতা আয়াতুল্লা ইমামী কাসামীর মতে, বিবাহ সম্বন্ধ বহির্ভূত কোন নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক ছোঁয়াছুঁয়িই হল সব অনর্থের মূল। তিনি বলেন যে, একটা ভীড় বাসের মধ্যে যতবার একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়, ততবারই ইসলামি বিপ্লবের সৌধ কেঁপে ওঠে। আয়াতুল্লা হুসেন দস্ত গিয়াবের মতে, বিবাহ সম্বন্ধ বহির্ভূত কোন নারী ও পুরুষ পরস্পরের দিকে তাকালে শয়তান খুশিতে মুচকি হাসে। ২৭০ জন সদস্যের বর্তমান ইরানী পার্লামেন্টে (মজলিস) ৪ জন মহিলা সদস্য আছেন। এঁদের মধ্যে একজন, শ্রীমতী মরিয়ম বেহ্‌রুজির মতে ইরানের বর্তমান সরকার যা করছে ঠিকই করছে। কারণ যৌন অত্যাচার সহ সবরকম অত্যাচার থেকেই মেয়েদের রক্ষা করার চেষ্টা করা উচিত।

ঐ খবরে আরও বলা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কূটনৈতিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। ১৯৮৬ সালে আলি খোমেইনীর জিম্বাবোয়ে সফরকালে তিনি সেখানকার এক মহিলা মন্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করলে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এতে রাষ্ট্রপতি রবার্ট মুগাবে অত্যন্ত রেগে যান এবং আলি খোমেইনীকে তৎক্ষণাৎ জিম্বাবোয়ে ত্যাগ করতে আদেশ দেন।গতবছর ইরানের বিদেশমন্ত্রী আলি আকবর বিলাইতীর জার্মানী সফরকালে তিনি সেখানকার মহিলা রাজনীতিকদের সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করলেও খুবই তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে গত বছর ভারতীয় অভিনেত্রী শ্রীমতী শাবানা আজমীর গালে নেলসন ম্যান্ডেলার চুমু খাওয়া নিয়ে মুসলিম জগতে কি শোরগোল উঠে ছিল তাও পাঠক স্মরণ করতে পারেন।

বর্তমান ইরানে মেয়েদের পক্ষে চুলে কলপ লাগানো, রঙচঙে পোষাক পরা, মাথায় টুপী পরা, বা পোষাকের মধ্য থেকে মাথায় চুল বেরিয়ে পড়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই সমস্ত অপরাধের প্রতি নজর রাখবার জন্য সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে বন্দুকধারী এক মহিলা পুলিশবাহিনী। কোন মহিলা উপরিউক্ত অপরাধগুলির কোন একটিতে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে পেটানো হয়। অনেককে আবার উত্তর-পশ্চিম তেহরানের কুখ্যাত এভিন কারায় বন্দিনী করা হয় এবং যথাযোগ্য অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু মেয়েদের প্রতি উপরিউক্ত বিধি-নিষেধগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটাই—পর্দা দিয়ে আবৃত করে নারীজাতিকে অশিক্ষিত ও অনগ্রসর করে রাখা। পুরুষের প্রতি পুরোপুরি নির্ভরশীল করে রেখে অস্থাবর সম্পত্তির মতো ব্যবহার করা। এ প্রসঙ্গে ইরানেরই একটি প্রগতিশীল মহিলা সমিতির বক্তব্য হল, এই সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল, নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা। এই পরিস্থিতিতে বর্তমান ইরানের নারী সমাজকে কতখানি শ্বাসরোধকর অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয় তা সহজেই অনুমান করা চলে। বাংলাদেশী লেখিকা শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন তাঁর "নির্বাচিত কলম"-এ কিছু কিছু বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে আঙুলের ডগার কোন সামান্য ক্ষতের চিকিৎসা করাতে এসে মেয়েরা ডাক্তারের সামনে নিজেদের অনাবৃত করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে মনুসংহিতার একটি শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে।

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈবাপ্তকারিভিঃ।

আত্মানমাত্মনা যাস্ত রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ॥ (৯/১২)

অর্থাৎ যে কামিনী দুঃশীলতা হেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয় তাহাকে আপ্ত পুরুষেরা গৃহরুদ্ধ রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাহারা সতত আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাদের রক্ষা না করিলেও সুরক্ষিত হইয়া থাকে। মনু আরও বলছেন, "কেহ কখনও বলপূর্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না (ন কশ্চিদ্ যোষিতঃ শক্তঃ প্রসহ্য পরিবক্ষিতুম্) (৯/১০)। যে সমাজে বা দেশে বিড়ালের উপদ্রব খুব বেশী সেখানে মাছ অবশ্যই ঢেকে রাখা দরকার। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই সে দোষটা মাছের নয়।

ইসলামের বিবাহ সম্পর্ক

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করা চলতে পারে, এ ব্যাপারে কোরান বলছে, "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদের বিবাহ করেছে তাদের তোমরা বিবাহ করো না" (৪/২২)।এই আয়াতের দ্বারা প্রাক্ ইসলামী যুগের বিধবা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিয়ে করার রীতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে। Muhammad Encyclopedia গ্রন্থে এরকম দুটো ঘটনার বর্ণনা আছে, যেখানে ছেলে তাঁর বিধবা বিমাতাদের বিবাহ করার অপরাধে উক্ত আয়াতের বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় (Vol. II, p. 830)। বিবাহ সম্পর্কে কোরানের পরবর্তী আয়াত বলছে, "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মা, মেয়ে, বোন, ফুফু (পিসী), খালা(মাসী), ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগিনী, শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস হয়েছে, তাঁর পূর্বস্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমার অভিভাবকত্বে আছে; তবে যদি তাদের সঙ্গে সহবাস না করে থাকো তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ—তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু বোনকে একসঙ্গে বিয়ে করা; পূর্বে যা হয়েছে হয়েছে; আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (৪/২৩)।

উপরিউক্ত আয়াতটিতে দেখা যাচ্ছে যে, (১) নিকট আত্মীয়তা সম্বন্ধযুক্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে ছাড়া প্রায় সকলকেই বিবাহ করা চলে,(২)ক্ষেত্রবিশেষে কন্যাস্থানীয়া রমণীকেও বিবাহ করা কোরান দ্বারা বৈধ এবং (৩) শেষে "যা হয়েছে হয়েছে" থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যে কয়টি বিধিনিষেধ কোরান আরোপ করেছে, পূর্বে তাও বৈধ ছিল। এতে অবাক হবার কিছু নেই। আগেই বলা হয়েছে যে, বর্বর পশুপালক ও যাযাবর ইহুদী জাতির দ্বারা যে ধর্মমতের সূচনা হয়েছিল, আরবের পশুপালকরা কিছু রদবদল করে তাকেই ইসলামে রূপান্তরিত করেছে। এই দুই অসভ্য জাতির জীবনযাত্রার মধ্যে তেমন কোন প্রভেদ না থাকায় ওল্ড টেস্টামেন্ট কোরানে রূপান্তরিত হতে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। কাজেই ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর গড যদি বলতে পারেন যে, "মা'রসঙ্গে যৌন সম্পর্ক করো না, কারণ তাতে বাবার অসম্মান হবে" বা, "বাবার অন্যান্য পত্নীর সঙ্গেও যৌন সম্পর্ক করো না, তাতেও বাবার অসম্মান হবে" (Leviticus : 18) [বাবা মারা গেলে বা নিরুদ্দেশ হলে কি বিধান হবে তা এই বর্বরদের ঈশ্বরই জানেন।] তাহলে কোরানের আল্লাও স্বচ্ছন্দে উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ করতে পারেন।

তবে সুখের কথা হল এই, ভারতের হিন্দু ধ্যানধারণা, হিন্দু জীবনধারা যেমন বর্বর মার্ক্সীয় তত্ত্বের প্রসার ঘটতে দেয়নি, ঠিক তেমনি ইসলামের কদর্য দিকগুলোকেও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রসার ঘটাতে বাধা দিয়েছে। এই কারণেই বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে হারেম তৈরী করার প্রবণতা অনেক কম। অপরদিকে সৌদি আরব ইত্যাদি দেশের বিত্তবান শেখরা ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি গরীব দেশগুলি থেকে পয়সার জোরে মেয়ে পাচার করে নিজেদের হারেম ভর্তি করছে। অসমর্থিত সংবাদ অনুসারে শুধু সৌদি আরবেই প্রায় ২০ লক্ষ ভারতীয় ও বাংলাদেশী মেয়ে ক্রীতদাসীর জীবনযাপন করছে।ইসলামের কদর্য দিকগুলো ঠিকমতো রপ্ত করতে না পারার জন্যই ঐসব দেশের শেখরা ভারত ও বাংলাদেশের মুসলমানদের ঠিক মুসলমান বলে মনে করে না, বেশ হীন চোখেই দেখে থাকে। বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানরা যে কট্টর মুসলমান হতে পারেনি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল, বাঙালী মুসলমান সমাজের মেয়েদের মধ্যে বোরখা দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত করে পর্দা করার প্রচলন একেবারেই নেই।

অনেকে আবার হিন্দু রমণীদের মতো শাঁখা সিঁদুরও পরেন।

কিন্তু যে বর্বর সমাজে ইসলামের আবির্ভাব, যে বর্বর সমাজে ইসলাম জন্মের আগে থেকেই নিকট সম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক প্রচলিত ছিল, সেই সমাজের আল্লার পক্ষে (৪/২৩) আয়াতের মতো আয়াত অবতীর্ণ না করে কোন উপায় ছিল না। কাজেই এইসব বর্বরদের সমাজে কোন নারীর পক্ষে কোন নিকট আত্মীয় পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। যাকে বিয়ে করা যায় তাকে ধর্ষণও করা যায়। তাই প্রতিটি মুসলমান বাড়ী এক একটি ছোট 'পতিতালয়' বা বেশ্যাখানা। সেখানে কাকা ভাইঝিকে, শ্বশুর পুত্রবধূকে, মামা ভাগ্নীকে, পুরুষ তার কাকাতো, জ্যেঠাতো, মামাতো বোনকে ধর্ষণ করছে। তা হলে সেই সমাজে নারীর নিরাপত্তা কোথায়? এই নিরাপত্তার অভাবও মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথা অপরিহার্য হয়ে ওঠার একটা অন্যতম কারণ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা দুঃখের কথা বা বেদনার কথা হল এই যে, আমাদের দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানরাও, জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে, বর্বর ইহুদী ও আরব্য সংস্কৃতিকে নকল করে চলেছেন। একজন ভারতীয় হিন্দু যখন ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়, তখন তার নৈতিক চরিত্রের কতখানি উন্নতি হয় বলা শক্ত। তবে সে যে তৎক্ষণাৎ নিকট আত্মীয়দের বিবাহ করার অধিকার অর্জন করে আরব্য বর্বরতার অংশীদার হয় সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামের প্রভাবে তারা এ ব্যাপারে কতখানি অনুপ্রাণিত হন, একটা ঘটনা থেকে তার কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। গত বছর রাজারহাট থানার অন্তর্গত হাতিয়াড়া গ্রামের বাসিন্দা আনিসুর রহমান নিজের ১৭ বছরের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় এবং তাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়। এ ব্যাপারে আনিসুরের স্ত্রী থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তখন দেখা যায় মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা। (বর্তমান—২৮/৬/ ৯৪)। হয়তো আনিসুর রহমান তার ধর্মেরই নবী হজরৎ লুতের কাছ থেকে উক্ত কর্মকাণ্ডের প্রেরণা লাভ করেছিল। স্ত্রী মারা গেলে হজরৎ লুৎ তাঁর দুই বয়স্কা কন্যার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

মুসলমান অ-মুসলমান চিহ্নিতকরণ

মুসলমানদের মতে সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী "ফোরকান" বা মহাগ্রন্থ কোরান আবির্ভূত হবার আগে জাহেলিয়া বা সবই খারাপ ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, প্রাক্-ইসলামী আরবের সেই "জাহেলিয়া" বা অন্ধকারময় অজ্ঞতার যুগেও অথবা, রফিক উল্লাহ্ সাহেবের ভাষায়, সেই যৌন ব্যভিচারের যুগেও, বেদুইন রমণীদের মধ্যে পর্দার প্রচলন ছিল না এবং তারা আজকের মুসলিম নারীদের থেকে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করত। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে John Bagot Glubb তাঁর 'Life and Times of Mohammad' গ্রন্থে লিখছেন, "The Bedouin women were free and unveiled and romantic courtship was a recognized institution. In the 6^{th} Century, the Bedouin women enjoyed considerable freedom. Young widows, for example, lived in their own tents and received their suitors as they felt inclined (p.27)"— অর্থাৎ (তখনকার) বেদুইন রমণীরা ছিল পদবিহীন ও স্বাধীন এবং মন দেওয়া নেওয়া ব্যাপারটা একটা স্বীকৃত সামাজিক রীতি বলে গণ্য হত। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বেদুইন রমণীরা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুবতী বিধবারা তাঁদের নিজস্ব তাঁবুতেই বসবাস করতো এবং সেখানে তাদের ভালোবাসার মানুষকে আপ্যায়ন করতো। কাজেই বলা যেতে পারে যে, কঠিন পর্দার আড়ালে আজকের মুসলিম নারীসমাজকে যে ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন জীবন কাটাতে হয় তা পুরোপুরিভাবে ইসলামেরই অবদান। এবং কী ভাবে এই পর্দা জন্ম নিল, কোরান এবং হাদিসেই তার যথেষ্ট সূত্র বিদ্যমান রয়েছে।

তৎকালীন আরবের অল্প সংখ্যক মুসলিম রমণীকে অ-মুসলমান রমণীদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার জন্যই সর্বপ্রথম পর্দার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ যখন প্রাণের ভয়ে মক্কা থেকে হিজরৎ করে মদিনায় এলেন, তখন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরও সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। এইসব নব্য মুসলমানরা তখন ছিল সংখ্যায় খুবই নগণ্য (মাত্র ২০০) এবং তাদের বলা হত উদ্বাস্তু বা মুহাজির। অপরদিকে যেসব মদিনাবাসীরা তাদের আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের বলা হত সাহায্যকারী বা আন্‌সার। একজন ধার্মিক ও সৎমানুষ হিসাবেই মদিনাবাসীরা মহম্মদকে মদিনায় নিয়ে এসেছিল এবং মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিল। কিন্তু এর ফল হল সম্পূর্ণ বিপরীত। সামান্য ধর্মপ্রচারক থেকে নবী হয়ে উঠলেন একজন শাসক ও সেনাধ্যক্ষ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মুহাজিররাই হয়ে উঠল মদিনার হর্তাকর্তা বিধাতা এবং আনসাররা নিজভূমে পরবাসীর মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হল। বিশেষ করে বদর যুদ্ধে জয়লাভের পর মুহাজিররাই হয়ে উঠল মদিনার একচ্ছত্র অধিপতি।

মদিনাবাসীরা যখন বুঝতে পারল যে, এ তো খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আলি, যুবায়ের, আব্বাস, ওমর, ওসমান, আকিল, তালহা ইত্যাদির মাধ্যমে মহম্মদ একটা শক্তিশালী গুণ্ডাবাহিনী তৈরী করে ফেলেছেন, যাদের অত্যাচারের ভয়ে মদিনাবাসীরা সবরকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হল।মুসলমানদের দৃষ্টিতে এই গুণ্ডারা হল ঈমান আনয়নকারী ও প্রতিষ্ঠাকারী সম্মানীয় ব্যক্তি এবং এদের নাম উচ্চারণ করার পর আলাই হেসসালাম (আল্লা তাকে শান্তি দিন) বলা বাধ্যতামূলক। আসমা বিন্‌ত মারওয়ান নামে এক মহিলা কবি মক্কা থেকে আগত এইসব

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উত্তেজক কবিতা লিখতে শুরু করলে মহম্মদের এক অনুগত অনুচর উমের বিন আদি তাকে রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে। ঠিক একই কারণে কবি আবু আফাককে সালিম বিন ওমর ও কবি কাব বিন আসরাফকে মহম্মদ বিন মাসলামা রাতের অন্ধকারে গুপ্ত হত্যা করে। কুরাইজা গোত্রের ৮০০ ইহুদীকে পাইকারী দরে হত্যা করার কারণও ছিল মদিনায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা। "আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা বিমত হয়"(৭/৯৪)। কোরানের এই বাণী অবতীর্ণ করে আল্লা অনেক আগেই নবীকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন। আল্লা আরও বলেছেন, "আশেপাশের লোকেরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক" (৯/ ১২৩)। তাই প্রকাশ্য দিবালোকে, বাজারের মতো একটা জনাকীর্ণ স্থানে ৮০০ নিরস্ত্র ইহুদীকে গণহত্যা করে মাটি চাপা দেওয়া হল, যাতে মদিনাবাসীরা মুসলমানদের কঠোরতা স্বচক্ষে দেখতে পায় ও তাদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু একজন মুসলমানের দ্বারা অপর একজন মুসলমান লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হলে তা হবে খুবই গর্হিত কাজ, কারণ কুল্লু মুসলেমীন ইখুয়াতুন, বা সব মুসলমান ভাই ভাই। তাই মদিনার সমস্ত মুসলমানদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ল। অন্যদের মতো তৎকালীন আরব বেদুইনরাও দাড়ি কামিয়ে গোঁফ রাখত। কিন্তু আল্লার রসুল বিধান দিলেন যে, এবার থেকে সব মুসলমানকে গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যেমন মুসলমানের দ্বারা মুসলমানের উপর নিপীড়নের সম্ভাবনা দূর হল, তেমনি একজন অ-মুসলমানকে চিহ্নিত করে যথেচ্ছ অত্যাচার চালাবার পথও সুগম হল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, প্রকৃত কারণ না জেনে ভারতীয়সহ সমগ্র মুসলিম জগৎ এই পবিত্র সুন্নত পালন করে চলেছে। ভাবছে যে, গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখলেই তারা আল্লার প্রিয়পাত্র বলে গণ্য হবে এবং তাদের বেহেস্তের পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হল এই যে, হয়তো প্রতিকূল পরিবেশে এই বিশেষ চিহ্নই তাদের মহা বিপদ ডেকে আনবে।

কিন্তু মুশকিল হল এই যে, উপরিউক্ত কায়দায় একজন মুসলমান রমণীকে অ-মুসলমান রমণীদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। অপরদিকে পরম করুণাময় আল্লা দয়াপরবশ হয়ে, কুমারী, সধবা, বিধবা, সব রকমের বিধর্মী নারীকেই মুসলমানদের কাছে বৈধ করে রেখেছেন। কাজেই কোন বিশ্বাসী যদি কোন মুসলমান রমণীকে বিধর্মী ভেবে ভুলক্রমে আল্লা আদিষ্ট বৈধ কর্মে লিপ্ত হয়, তা হলে তা হবে খুবই গর্হিত কাজ। তাই জরুরী হয়ে পড়ল অ-মুসলমান নারীদের থেকে মুসলমান নারীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে আলাদা করা। এই সময় মহম্মদের এক অনুগত পার্শ্বচর ওমর, (যে বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা ও মক্কার কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়ার ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়েছিল) মুসলমান রমণীদের পর্দাবৃত করে চিহ্নিত করার পরামর্শ দিল। যখন পরম করুণাময় ও সর্বজ্ঞ আল্লা দেখলেন যে বুদ্ধিটা মন্দ দেয়নি। তখন তিনি আর সময় নষ্ট না করে কোরানের বাণী অবতীর্ণ করে ওমরের সুপারিশকে অনুমোদন করলেন। আল্লা বললেন, "হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ তাদের মুখমণ্ডলের উপর টেনে দেয়; এতে করে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না" (৩৩/৫৯)। আল্লার উপরিউক্ত বাণীর মাধ্যমে পর্দার প্রাথমিক উদ্দেশ্য খুবই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে এবং আল্লার আদেশ অমান্য করলে যে ভুলক্রমে উত্যক্ত হবার সম্ভাবনা আছে তাও তিনি বেশ পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে, এই সমস্ত আয়াতও কী করে সর্বজ্ঞ আল্লা তাঁর মণিমুক্তা দিয়ে বাঁধানো স্বর্গীয় কোরানে লিখে রেখেছিলেন।

বিবি খাদিজা ও বিবি সৌদা

যদি না আল্লার রসুল মদিনায় তাঁর হারেম তৈরী করতেন এবং সেই হারেম সুরক্ষার জন্য পর্দা অপরিহার্য হয়ে উঠত তাহলে হয়তো করুণাময় আল্লা পর্দা সম্পর্কীয় উপরিউক্ত আয়তটি অবতীর্ণ করেই ক্ষান্ত থাকতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তবে তা ঘটল না। নবীর আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে মদিনায় তিনি তাঁর হারেম তৈরী করলেন এবং সেই হারেমকে সুরক্ষিত করতে আল্লাও অনেক অনেক আয়াত অবতীর্ণ করে পর্দাকে নিশ্ছিদ্র করলেন। পর্দাকে কঠিন ধর্মীয় তথা সামাজিক অনুশাসনে পরিণত করলেন।

৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পত্নী খাদিজার সঙ্গে যখন মহম্মদের বিবাহ হয় তখন নবীর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। খাদিজা জীবিত থাকাকালীন নবী দ্বিতীয় কোন পত্নী গ্রহণ করেননি। সেই সময়কার আরব সমাজ, যে সমাজে সঙ্গতিসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত আরবদের বহুবিবাহ করা বলতে গেলে একটা সামাজিক রীতি ছিল, সেই সমাজে নবী দ্বিতীয় কোন দার পরিগ্রহ না করায় অনেকের মনে এই ধারণা জন্মানো স্বাভাবিক যে, নবী হয়তো তখন খুবই সাত্ত্বিক জীবন যাপন করতেন বা তিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সেই সময়কার আরব সমাজেও কোন রমণী যদি যথেষ্ট ধনশালী ও প্রভাবশালী হতেন তবে তাঁর স্বামীর পক্ষে একাধিক বিবাহ করা সম্ভব হত না। এ ব্যাপারে একটা ঘটনার অবতারণা করা চলতে পারে।নবী তাঁর প্রিয় ও আদরের কন্যা ফতেমাকে কাকা আবু তালেবের ছেলে আলির সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু মহম্মদ নবী ও মদিনার শাসক হয়ে প্রভাবশালী হয়ে ওঠায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলির পক্ষে দ্বিতীয় কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবু জাহল নামে মহম্মদের এক ঘোরতর শত্রু ছিল যে বদর যুদ্ধে মারা যায়। মক্কা বিজয়ের পর আলি আবু জাহলের মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। ফতেমা এ সংবাদ পিতা মহম্মদকে জানালে তিনি অত্যন্ত রেগে যান এবং বলেন, "না, এ কখনই হতে পারে না। আলি যদি আবু জাহলের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তবে তার আগে ফতেমাকে তালাক দিতে হবে। আমি ও ফতেমা অভিন্ন। যে ফতেমাকে উত্যক্ত করে সে আমাকে উত্যক্ত করে, যে ফতেমার শত্রুতা করে সে আমার শত্রুতা করে" (মুসলিম ৫৯৯৯)। প্রকৃতপক্ষে অর্থ ও বংশমর্যাদার দিক থেকে খাদিজা ছিলেন মহম্মদের অনেক উপরে এবং বাস্তবিকভাবে মহম্মদ ছিলেন খাদিজার অনুগ্রহধন্য। অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, খাদিজা জীবিত থাকাকালীন মহম্মদ নবী হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। ৬১৯ সালে খাদিজা মারা যাবার দু-বছর পর হিজরৎবা মক্কা থেকে মদিনায় আসার পর থেকেই তাঁর ভাগ্য ফিরতে শুরু করে।

কোরেশ বংশীয় সক্রান ও তাঁর স্ত্রী সৌদা ইসলামের শৈশবেই মুসলমান হন। পরে এই সব নব্য মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার শুরু হলে সক্রানও সৌদা আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যান। সেখান থেকে ফেরার পথে সক্রান মারা গেলে মহম্মদ বিধবা সৌদাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান এবং খাদিজা মারা যাবার দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। সেই সময় সৌদার বয়স ছিল ৫০ বছর। পরে নবী যখন একাধিক যুবতী স্ত্রীর দ্বারা তাঁর হারেম পূর্ণ করলেন তখন বয়স্কা সৌদাকে বর্জন করার কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তালাক দেননি। নবীর মৃত্যুর পর সৌদা আরও ১০ বছর জীবিত

ছিলেন।

বিবি আয়েশা

মহম্মদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধু ছিলেন মক্কার ধনী ব্যবসায়ী আবু বকর (মহম্মদের মৃত্যুর পর ইনি মুসলিম জগতের প্রথম খলিফা হন)। আবু বকর শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল বকর বা কুমারীর বাবা এবং যে কুমারীকে লক্ষ্য করে এই নাম সে ছিল তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আয়েশা। খাদিজা মারা যাবার সময় মহম্মদের কনিষ্ঠা কন্যা ফতেমার বয়স ছিল ১৪/১৫ বছর। সেই সময় আবু বকরের মক্কার হারেমে ১৬ জন পত্নী ছিল এবং তা সত্ত্বেও তাঁর কিশোরী ফতেমার প্রতি লোভ ছিল। অপরদিকে ৫/৬ বছরের শিশু আয়েশার প্রতি নবী মহম্মদের আসক্তি ছিল।

তৎকালীন আরবসমাজে শিখর বিবাহ নামে একরকম বিবাহের প্রচলন ছিল যা আমাদের বদল বিবাহের মতো। এই রীতি অনুসারে মহম্মদ ও আবু বকর নিজেদের মধ্যে এই চুক্তি করেন যে, মহম্মদ ফতেমাকে আবু বকরের সাথে এবং আবু বকর আয়েশাকে মহম্মদের সাথে বিবাহ দেবেন। যে বছর সৌদার সাথে নবীর বিবাহ হয় সেই বছরই, উপরিউক্ত বোঝাপড়া অনুসারে আয়েশা নবীর বাগ্‌দত্তা বধুতে পরিণত হন। মহম্মদের বয়স তখন ৫০ বছর এবং আয়েশার বয়স ৫/৬ বছর।

ইসলামী বিধি অনুযায়ী কোন রমণীকে, বিশেষভাবে কোন কুমারীকে তার সম্মতি ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাবে না। ই. আব্বাস বর্ণিত হাদিস বলছে, "পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রীলোক (অর্থাৎ বিধবা বা তালাক প্রাপ্ত) তার অভিভাবকদের চাইতে নিজেই নিজের অভিভাবক হবার অধিকতর অধিকারী, কিন্তু কুমারী বালিকার সম্মতি চাইতে হবে এবং তার নীরবতাই তার সম্মতি (মুসলিম-৩৩০৭)। কাজেই জানতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক যে, নবী যখন কুমারী আয়েশাকে বাগ্‌দত্তা পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তখন কীভাবে তার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। সম্ভবতঃ নীরবতাই সম্মতি বলে গণ্য হয়েছিল কারণ ৬ বছরের একটি শিশুর কাছ থেকে এ প্রস্তাবের জবাবে নীরবতা ছাড়া আর কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র।

যাই হোক, হিজরীর প্রথম বছরে মদিনায়, আবু বকরের বাড়ীতে যখন এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয় তখন মহম্মদের বয়স ৫২ বছর এবং বিবি আয়েশার বয়স ৬ বছর। কাজেই এই বিবাহের দ্বারা স্বয়ং নবী যে নারীজাতিকে যারপরনাই মহিমান্বিত করে গেছেন তা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যার সৈয়দ আমির আলি তাঁর 'স্পিরিট অফ ইসলাম' গ্রন্থে লিখছেন যে, ব্যক্তিগত ভোগ বা লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নবী এই বিবাহ করেননি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আবু বকরের সাথে বন্ধুত্ব আত্মীয়তার পর্যায়ে উন্নীত করে তাকে চিরস্থায়ী করা।যদি তাই হয় তবে নবী কেন আবু বকরের বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যা আসমাকে বিয়ে করে এই মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দিকে অগ্রসর হলেন না? অথবা খাদিজা জীবিত থাকাকালীনই বা কেন নবীর মনে এই মহৎ উদ্দেশ্য জাগরিত হল না? যাই হোক, আয়েশাকে নবীর সাথে বিয়ে দেবার পর আবু বকর অনেকদিন আশায় আশায় থাকলেন, কবে নবী তাঁর সাথে ফতেমার বিয়ে দেবেন। কিন্তু নবী এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য না করায় তিনি একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলে নবী বললেন যে, এ ব্যাপারে তিনি এখনও আল্লার কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাননি। এ সংবাদ ওমরকে জানালে ওমর বললেন, "নবী আপনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন।"

নবী যতগুলি বিবাহ করেছিলেন তার মধ্যে একমাত্র আয়েশাই ছিলেন কুমারী এবং এ ছাড়া আর

সকলেই ছিলেন, হয় বিধবা নয় তালাকপ্রাপ্তা। যাই হোক, ৫২ বছরের প্রৌঢ় নবীর দ্বারা ৬ বছরের একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করাকে সুরুচিকর বলে ব্যাখ্যা করতে এবং তাকে একটা আধ্যাত্মিক রূপ দিতে আল্লার বান্দারা খুবই অসহায় বোধ করেন। জনাব এম. আবদুর রহমান তাঁর 'নবীদের জীবনসঙ্গিনী' নামক পুস্তকে লিখছেন, "অ-মুসলমানদের অনেকেই বিবি আয়েশার বিবাহকে উপলক্ষ্য করে হজরৎ মোহম্মদ (দঃ)-কে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে কসুর করেন না। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, কর্তব্যের খাতিরেই হজরৎকে এ বিবাহ করতে হয়েছিল। শরিয়তে ইসলামে (ইসলামের বিধান শাস্ত্রে) নারীদের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিধি-বিধান ও কানুন আছে।হালাল ও হারাম (বৈধ-অবৈধ), পাক-নাপাক (পবিত্র-অপবিত্র) প্রভৃতি বিষয়ে এবং নারীসমাজের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিবহাল (অবগত) ও পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করতে হলে সুশিক্ষিতা নারীর মাধ্যমেই সে শিক্ষাদান সহজসাধ্য হয়। নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জানানাকে শরিয়তের সকল বিষয়, বিশেষ করে যৌন সম্বন্ধীয় নাজুক বিষয়ে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। অল্পবয়স্কা ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীই এ সকল বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য পাত্রী।...অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মন ও মস্তিষ্ক থাকে শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী, নারীসমাজকে বিবি আয়েশার মারফৎ শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দেবার জন্যই হজরৎ মোহাম্মদ (দঃ) অল্প বয়স্কা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায় যে, আলেমা (বিদুষী) আয়েশা বার'শ দশটি হাদিস রওয়ায়েত বা বর্ণনা করেছিলেন। এত বিপুল সংখ্যক হাদিস হজরতের আর কোন পবিত্রা পত্নীর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।" (পৃ. ৬৪)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মানবজাতিকে এবং বিশেষ করে নারীসমাজকে নাজুক যৌন বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্যই আয়েশাকে বিবাহ করা নবীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং এই সমস্ত মূল্যবান শিক্ষা, যা তিনি নবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা তিনি মানবজাতির উপকারার্থে হাদিস বর্ণনার মাধ্যমে রেখে গেছেন। তাই এই মূল্যবান শিক্ষার নমুনা হিসাবে বিবি আয়েশা বর্ণিত সেইসব অতি মূল্যবান হাদিসের কয়েকটা উল্লেখ করা যেতে পারে। আয়েশা বর্ণনা করছেন, "জামা কাপড়ে কোথাও বীর্য লেগে থাকলে আল্লার রসুল শুধু সেই জায়গাটুকুই ধুয়ে, সেই জামাকাপড় পরেই নামাজে যেতেন" (মুসলিম-৫৭০)। কখনও কখনও তিনি (আয়েশা) সেই শুকিয়ে যাওয়া বীর্য নখ দিয়ে খুঁটে তুলে দিতেন, ধোবার প্রয়োজন হত না (মুসলিম-৫৭২)। আয়েশা বর্ণনা করছেন, "আল্লার রসুল অনেক সময় আমার কোলে মাথা রেখে কোরান আবৃত্তি করতেন, যখন আমি ঋতুমতী ছিলাম (মুসলিম-৫৯১)। পুণ্যাকাঙ্ক্ষী অনেক মুসলমান পবিত্র রমজান মাসের শেষে দশ দিন স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করে মসজিদের মধ্যে কাটান।একে এত্তেকাফ বলে। নবী মহম্মদ মদিনার মসজিদে এত্তেকাফ করতেন এবং মসজিদের পাশেই ছিল বিবি আয়েশার ঘর। বিবি আয়েশা বর্ণনা করছেন, নবী এত্তেকাফে থাকাকালীন জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিতেন এবং তিনি ঋতুমতী অবস্থায় নবীর চুল আঁচড়ে দিতেন" (মুসলিম-৫৮৪)। কোন এক ব্যক্তি একদিন বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্নান করা আবশ্যিক। তখন বিবি আয়েশা বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের উপর বসে এবং তাদের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে তখনই স্নান করা আবশ্যিক" (মুসলিম-৬৮৪)। বিবি আয়েশা বর্ণনা করছেন যে, একদিন এক ব্যক্তি নবীকে জিজ্ঞাসা করে যে, বীর্যপাত না হওয়া সত্ত্বেও কি যৌনমিলনের পর স্নান করা বাধ্যতামূলক? নবী তখন আঙুল তুলে বিবি আয়েশাকে দেখিয়ে বললেন, "সে আর আমি প্রায়ই এরকম করি এবং তারপর স্নান করি" (মুসলিম-৬৮৫)। কাজেই বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে, নবীর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে বিবি আয়েশা যদি উপরিউক্ত হাদিসগুলোর মতো অসংখ্য হাদিস (মোট ১২১০টি) রেখে না যেতেন তা হলে মানবজাতির কী অপূরণীয় ক্ষতিই না হত। সুতরাং এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, নবী যদি শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযুক্ত অল্প বয়স্কা আরও কয়েকটি মস্তিষ্ককে শিক্ষিত করার চেষ্টা করতেন তবে মানবজাতির কী উপকারই না সাধিত হত। এবং আবদুর রহমান সাহেবেরও আহ্লাদিত হবার কারণ ঘটত।

এ ব্যাপারে আবদুর রহমান সাহেব আরও লিখছেন, "পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বছর বয়সে একটি ছোট বালিকাকে বিবাহ করার মধ্যে যে কামের কুৎসিত প্রেরণা থাকতে পারে না, যৌনবিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকারা তা অস্বীকার করবে না বলে আমার বিশ্বাস। হজরত আয়েশা-মোহাম্মদ (দঃ) এর সাদী মোবারক সম্বন্ধে যাঁরা অপ্রীতিকর মন্তব্য করেন, তাঁদের হৃদয়-মন যে পবিত্র নয় এবং তাঁরা যে 'দ্বীন-ইসলামকে' সুনজরে

দেখেন না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই" (পৃ. ৬৫)। উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্যে আবেগের বশে আবদুর রহমান সাহেব নিজের অজ্ঞাতসারে ইসলাম বিরোধী মন্তব্য করে ফেলেছেন। কাম কুৎসিত, ইসলাম এ কথা বলে না। উপরন্তু, যেন তেন প্রকারেণ কামের চরিতার্থতাই ইসলামের নির্দেশ ও প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। মহম্মদের উম্মতদের মধ্যে কেউ বিয়ে সাদী না করে কাম দমন করার কথা বললে, তিনি বলতেন, "ওরা কি সব পাগল হয়েছে, অথচ আমি নামাজ করি, ঘুমাই, রোজা রাখি, রোজা বন্ধ করি এবং বেশ কয়েকজন স্ত্রীলোককেও বিয়ে করেছি? যারা আমার সুন্নত না মানবে তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই" (মুসলিম-৩২৩৬)। মহম্মদ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করাকে মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ তো করেছেনই, উপরন্তু বলতেন, "আমার উম্মতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যার সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পত্নী আছে। যে নবীকে আবদুর রহমান সাহেব কামশূন্য সাত্ত্বিক বানাতে চাইছেন, সেই নবীই গর্ব করে বলতেন যে, একদিন ফেরেস্তা জিব্রাইল তাঁকে এক বাটি আরক পান করতে দেয়, যা পান করে নবীর যৌন ক্ষমতা ৪০টা মানুষের সমান হয়ে যায়। ডাক্তার হিসাবে শ্রীমতী তসলিমা নাসরিন মন্তব্য করেছেন যে, পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে অনেক পুরুষের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয় এবং তখন সাময়িকভাবে তাদের যৌন কামনা বহুগুণ বেড়ে যায়, বিশেষ করে ঐ অবস্থায় সেই পুরুষের কাম অল্পবয়স্কা বালিকাদের প্রতি বেশী পরিমাণে ধাবিত হয়। সবথেকে বড় কথা হল, কামকে কুৎসিত মনে করলে আবদুর রহমান সাহেব স্বর্গে গিয়ে এত হাজার হাজার হুরীদের নিয়ে করবেন কি? স্বর্গে গিয়ে এরকম ইসলাম বিরোধী মন্তব্য করলে তিনি অবশ্যই স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হবেন।

সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, আবদুর রহমান সাহেব আসল এবং সবথেকে জোরালো যুক্তিটা উত্থাপন না করে আজেবাজে কথায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে গেলেন কেন? এক যুক্তিতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর তা হল, হজরৎ আয়েশা ও হজরৎ মোহাম্মদের বিবাহ আল্লা নির্দিষ্ট ছিল এবং আল্লার আদেশ পালন না করে নবীর উপায় ছিল না। ফেরেস্তা জিব্রাইল পর পর তিন রাত্রে মহম্মদকে আয়েশার ছবি দেখিয়ে বলেন, "এই তোমার পত্নী।" প্রথম দু রাত্রি তিনি ছবিটা ঠিকমতো না দেখানোতে নবী বুঝতে পারেননি সেটা কার ছবি। কিন্তু তৃতীয় রাত্রে নবী পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে, সেটা বিবি আয়েশার ছবি (মুসলিম ৫৯৭৭)। আবদুল জব্বার সাহেবের 'বাংলার চালচিত্র' যখন 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন কোন একটা সংখ্যায় তিনি একটা ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন। তাঁদের এলাকার জনৈক ধনী মুসলমান বৃদ্ধ জনৈকা অল্পবয়স্কা বালিকাকে টাকার জোরে বিয়ে করে হারেমে ঢুকিয়েছিল। বিয়ের আগে আবদুল জব্বার সাহেব একদিন ঐ বালিকাটির বাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় কাক তাড়াতে গিয়ে বালিকাটির বুকের কাপড় সরে যায় এবং আবদুল জব্বার সাহেবকে দেখে সে লজ্জায় ছুটে ঘরে পালায়। বৃদ্ধের সঙ্গে ঐ বালিকার বিয়ে হবার কিছুদিন পরে আবদুল জব্বার সাহেব একদিন দেখতে পেলেন যে, একটা কাক একটা মরা ইঁদুরের কান খুঁচিয়ে মাথার ঘিলু বার করে খাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে আবদুল জব্বার সাহেবের হঠাৎ সেই বালিকার কথা মনে হল। তিনি ভাবতে থাকলেন যে, এমনি করেই সেই বৃদ্ধ রোজ রাত্রে সেই বালিকার ঘিলু বার করে খাচ্ছে। কিন্তু আবদুল জব্বার সাহেব কোথাও এ সংবাদ দেননি যে, ঐ বৃদ্ধ ও ঐ বালিকার বিবাহ আল্লা নির্দিষ্ট ছিল কি না? অথবা ফেরেস্তা জিব্রাইল তিন রাত্রে ঐ বৃদ্ধকে ঐ বালিকার ছবি দেখিয়েছিলেন কি না? অথবা ঐ বৃদ্ধ নাজুক যৌন ব্যাপারে পাক নাপাক, হালাল হারাম ইত্যাদি শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযুক্ত একটি অল্প বয়স্কা মস্তিষ্কের খোঁজ খবর করছিল কি না?

বিবি হাফসা, বিবি জয়নব (১) ও উম্মে সালামা

মহম্মদের আর এক অনুগত অনুচরের নাম ছিল ওমর, যিনি পরবর্তীকালে ইসলাম জগতের দ্বিতীয় খলিফা হন।ওমরের মেয়ের নাম ছিল হাফসা। হাফসার স্বামী খুনিস বদর যুদ্ধে মারা যায়। হিজরীর দ্বিতীয় বছরে মহম্মদ-খাদিজার আর এক মেয়ে রুকাইয়া মাত্র ২২ বছর বয়সে মারা যায়। রুকাইয়ার স্বামীর নাম ছিল ওসমান। ওমর প্রথমে বিপত্নীক ওসমানের সঙ্গে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব করলেন, কিন্তু ওসমান তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর ওমর একই প্রস্তাব আবু বকরকে করলেন কিন্তু তিনিও রাজী হলেন না। দুইজনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ওমর ভীষণ রেগে গেলেন এবং মহম্মদের কাছে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। নবী তখন মুচকি মুচকি হেসে ওমরকে বললেন যে, ঐ দুজনের থেকেও ভালো পাত্র যদি তিনি যোগাড় করে দেন তাহলে কেমন হয়। ওমর প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারলেন না। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলেন যে, নবী স্বয়ং হাফসাকে বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে ইচ্ছুক, তখন যারপরনাই আহ্লাদিত হলেন। যাই হোক, হিজরীর তৃতীয় বছরে নবী চতুর্থ পত্নী হিসাবে হাফসাকে হারেমে তুললেন। তখন নবীর বয়স ৫৬ ও হাফসার বয়স ১৮ থেকে ২২-এর মধ্যে। অপরদিকে ওসমান মহম্মদের তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুমের পাণিগ্রহণ করলেন। ঐ বছরই মহম্মদ জয়নব বিন্‌ত খোজাইমা নামে অপর এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। জয়নবের স্বামী, মহম্মদের চাচাত ভাই, ওবেদা, বদর যুদ্ধে মারা গেলে নবী তাকে বিয়ে করেন। অনেকের মতে, এ বিবাহ মাত্র ৩ মাস স্থায়ী হয়। কিন্তু W. Muir-এর মতে বিয়ের ২/১ বছর পরে জয়নবের মৃত্যু হয়।

মহম্মদের আরেক অনুচর, আবু সালামা, অহুদের যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রথম দিনে ক্ষত শুকিয়ে আসে, কিন্তু কিছুদিন পরই তা আবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং ওহুদ যুদ্ধের ৮ মাস পরে সে মারা যায়। আবু সালামা মারা যাবার ৪ মাস পরে মহম্মদ তার বিধবা পত্নী উম্মে সালামাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উম্মে সালামা দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। এ বিয়ের আরও একটা ইতিহাস আছে। আবু সালামা মারা গেলে, উম্মে সালামা যখন তার মৃত্যু সংবাদ মহম্মদকে জানাতে গেলেন, তখন মহম্মদ তাঁকে বললেন, "আল্লার কাছে প্রার্থনা কর, হে আল্লা, আমাকে ও তাকে (অর্থাৎ আবু সালামাকে) ক্ষমা করুন এবং আমাকে তার (আবু সালামার) থেকে ভালো স্বামী দিন" (মুসলিম-২০০২)। উম্মে সালামা প্রথমে তাঁর বয়স ও অনেক (৩টি) ছেলেমেয়ের কারণ দেখিয়ে নবীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে নবী তাঁর নাবালক ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের আশ্বাস দিলে উম্মে সালামা বিয়েতে রাজী হন। জয়নব বিন্‌ত খোজাইমাকে বিয়ে করার এক মাসের মধ্যে এই বিয়ে সংগঠিত হয়। হিজরীর ৬১ সালে, ৮৪ বছর বয়সে উম্মে সালামার মৃত্যু হয়।

ইতিমধ্যে নবীর বয়স প্রায় ষাটে পৌঁছেছে। 'তারিখ তাবারি' অনুসারে ঐ সময় বয়সের সাথে সাথে নবীর যৌন কামনাও যেন বাড়তে থাকে। এই বর্ধিত যৌন কামনা নবীকে তাঁর তৎকালীন হারেমে সন্তুষ্ট করতে পারল না, বরং নতুন নতুন সুন্দরীতে হারেম বাড়িয়ে যেতে ইন্ধন যোগাতে থাকল (Muhammad

Encyclopedia, Vol. I, p. 1460)। এই মন্তব্যের সাথে সাথে স্যার সৈয়দ আমির আলি সহ অন্যান্য ভারতীয় মুসলমান জীবনীকারদের মন্তব্যের মিল পাওয়া যায় না। আমির আলির মতে, ব্যক্তিগত কামনা চরিতার্থ করার জন্য নবী কোন বিয়ে করেননি। তাঁর সব বিবাহের পিছনেই একটা না একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল—যেমন বিধবাকে আশ্রয় দান, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক চিরস্থায়ী করা, অথবা শত্রুর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। পক্ষান্তরে শ্রীমতী তসলিমা নাসরিনের পূর্বোক্ত মন্তব্যের মধ্যে, তারিখ তাবারির মন্তব্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কেন আমাদের দেশের মুসলমানরা এত রেখে ঢেকে বলার চেষ্টা করেন? আর কেনই বা আরবী, ফার্সী ইত্যাদি জীবনীকাররা সবকিছু খোলাখুলি বলে ফেলেন? এর মূল কারণ একটি। আরব সমাজ হল বর্বর পশুপালকের সমাজ, তাই সেই সমাজের লোকের কাছে নবীর জীবন খোলামেলা আলোচনা করতে ভয়ের কিছু নেই। ক্ষমতাশালী পুরুষ অসংখ্য রমণীর দ্বারা হারেম সৃষ্টি করবে, সেই সমাজের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় সমাজ এর ঠিক বিপরীত। ভারতীয় সমাজ বর্বরদের সমাজ নয়, বল্গাহীন ভোগের সমাজ বা ন্যায়-নীতিহীন নিষ্ঠুরতার সমাজ নয়, ত্যাগই ভারতীয় সমাজের আদর্শ, ভোগ নয়। ভারতীয় সমাজ হল "ত্যাগেনৈকেন তত্ত্বমানসু"র সমাজ। ভারতীয় সমাজ হল, "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা"র সমাজ, "পঞ্চাশোর্ধ্ব বনং ব্রজেৎ"-এর সমাজ। ভারতীয় মুসলমানরা ইসলাম গ্রহণের মধ্যে দিয়ে পশুপালক বর্বর আরব্য সমাজকে নকল করতে শুরু করেছেন, তাদের যথেচ্ছ নারীসম্ভোগ ও নিষ্ঠুরতাকে নকল করতে শুরু করেছেন, সে ইতিহাসও ৫০০ বছরের বেশী পুরানো নয়। তাই এই ৫০০ বছরের মধ্যে তাঁরা তাঁদের বিগত হাজার হাজার বছরের সনাতন ভারতীয় সংস্কার পুরোপুরি ঝেড়ে মুছে ফেলবেন তা এক অসম্ভব ব্যাপার। ধর্মে মুসলমান হলেও, মূলতঃ রামায়ণ মহাভারতের সংস্কারই ফল্গু নদীর মতো তাঁদের শিরায় শিরায় বয়ে যাচ্ছে। তাই এই সমস্ত ভারতীয় মুসলমানদের কাছে নবীর জীবন খোলামেলাভাবে তুলে ধরলে তাঁর ভাবমূর্ত্তি টিকিয়ে রাখাই অসম্ভব হবে। তাই বেশীরভাগ ভারতীয় জীবনীকার নবীর বিবাহের ব্যাপারটা সযত্নে এড়িয়ে চলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, জনাব আবদুল আজিজ আল আমান, দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'কাবার পথে' গ্রন্থে নবীর জীবনের আর সব দিকগুলোই আলোচনা করেছেন, শুধু বিবাহগুলি ছাড়া। আর যাঁরা বিবাহগুলি আলোচনা করেন, তাঁরা ঐগুলি বর্ণনা করতে যত পৃষ্ঠা খরচ করেন তার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশী পৃষ্ঠা খরচ করেন বিবাহগুলিকে নির্দোষ প্রমাণ করতে। কিন্তু হাজার হাজার পৃষ্ঠা খরচ করেও কি একটা ত্রিভুজকে বৃত্ত প্রমাণ করা চলে!

জয়নব (২)

যায়েদ নামে সীরিয়ার কাব গোত্রের একটি খ্রিস্টান ছেলেকে দুর্বৃত্তরা ছোটবেলায় চুরি করে নিয়ে যায় এবং সীরিয়াবাসী খাদিজার এক নিকট আত্মীয়ের কাছে বিক্রী করে দেয়। পরে সেই আত্মীয় যায়েদকে মক্কায় নিয়ে আসে এবং খাদিজাকে দান করে। মহম্মদের সাথে বিয়ে হবার পর খদিজা যায়েদকে তাঁর খাস চাকর নিযুক্ত করে এবং কালক্রমে সে মহম্মদের খুবই প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে যায়েদের বাবা অনেক খোঁজখবর করার পর মক্কায় এসে উপস্থিত হয় এবং মোটা টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেলের মুক্তি দাবী করে। কিন্তু যায়েদ তার বাবার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে, বরং মহম্মদের কাছেই থাকতে চায়। মহম্মদ তখন যায়েদের হাত ধরে তাকে কাবায় নিয়ে যান এবং সকলের সামনে তাকে পুত্র বলে ঘোষণা করেন। যায়েদের বয়স তখন দশ বছর এবং এই ঘটনার পর থেকে সে মহম্মদের ছেলে যায়েদ বা যায়েদ বিন মহম্মদ নামে পরিচিত হয়।

পরে যায়েদ বড় হলে মহম্মদ তার সাথে জয়নব নামে সম্রান্ত বংশীয়া এক সুন্দরী যুবতীর বিবাহ দেন। প্রকৃতপক্ষে জয়নব ছিলেন মহম্মদের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের কন্যা মাইমার মেয়ে। অর্থাৎ সম্পর্কে মহম্মদের পিসতুতো বোন। কথিত আছে যে মাইমা ও তার ছেলে আবদুল্লা প্রথমে এ বিয়ের ঘোরতর বিরোধী ছিল। কারণ মহম্মদের পালিত পুত্র হলে কী হবে, যায়েদের আসল পরিচয় হল, সে একজন ক্রীতদাস। যাই হোক, মহম্মদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তারা মত দেয়।

ইতিমধ্যে, বেশ কয়েকবছর পার হয়ে গেছে। জয়নবের বয়স তখন প্রায় ৩৫ বছর। এই সময় মহম্মদ একদিন যায়েদের বাড়ী যান। যায়েদ তখন বাড়ী ছিল না। অনেকের মতে ঐ সময় জয়নব বাড়ীর ভিতরে স্বল্প বেশবাস পরিহিত অবস্থায় ছিলেন এবং মহম্মদের সাড়া পেয়ে সেই অবস্থাতেই দরজা খুলে নবীকে অভ্যর্থনা জানান। অন্য মতে ঐ সময় হাওয়ায় দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে যায় অথবা পর্দাটা উড়ে যায় এবং মহম্মদ বাড়ীর ভিতরে স্বল্পবাস পরিহিত জয়নবকে দেখতে পান। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে আপনা থেকেই মহম্মদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, "শোভানাল্লা" বা "হৃদয়ের অধীশ্বর আল্লাকে ধন্যবাদ।"

যায়েদ বাড়ী ফিরে সব শুনে বুঝতে পারল যে, পূর্ব উপকারীর স্বার্থে জয়নবকে ত্যাগ করাই তার পক্ষে উচিত কাজ হবে এবং তখনই সে জয়নবকে তালাক দেবে বলে মনস্থির করে ফেলল। পরে সে যখন এ ব্যাপারে নবীর অনুমতি প্রার্থনা করল তখন মহম্মদ তাকে বললেন, "তুমি কি এখন পর্যন্ত জয়নবের মধ্যে খারাপ কিছু লক্ষ্য করেছ?" যায়েদ বলল, "না, আল্লার রসুল।" তখন তিনি বললেন, "ঘরে গিয়ে স্ত্রীকে রক্ষা কর ও উত্তমরূপে প্রতিপালন কর, কারণ আল্লা বলেছেন যে, স্ত্রীর প্রতি যত্নবান হও ও আল্লাকে ভয় কর।" লোকের ভয়ে তিনি তাঁর মনের কথা প্রকাশ করলেন না বটে, তবে জয়নবের প্রতি তাঁর কামনা ও আকর্ষণ এতই প্রবল হল যে তিনি অন্তরে দগ্ধ হতে থাকলেন। কিন্তু প্রিয় নবীর মনোবেদনা লক্ষ্য করে আল্লার পক্ষে আর নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব হল না। নবীর এই অনুচিত কামকে সমর্থন জানিয়ে এবং লোকভয় ত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়ে আল্লা কোরানের বাণী অবতীর্ণ করলেন, "স্মরণ কর, আল্লা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, আল্লাকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করেছিলে, আল্লা তা প্রকাশ

করে দিচ্ছেন; তুমি লোকভয় করেছিলে, অথচ আল্লাকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত" (৩৩/৩৭)।

এ প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা বলে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। নবী যতদিন মক্কায় ছিলেন আল্লা ততদিন, কীভাবে তাঁর উম্মতরা তাঁর উপাসনা করবে, দোয়া চাইবে ইত্যাদি অহিংস ও নির্দোষ আয়াত অবতীর্ণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু নবীর মদিনা আগমনের পর আল্লার খেয়াল হল যে, তাঁর প্রিয় নবীর বৈষয়িক ও মানসিক সুখসুবিধার প্রতিও তাঁর সমানভাবে নজর দেওয়া দরকার। তিনি প্রথমে লুঠতরাজ, দাঙ্গাহাঙ্গামার মাধ্যমে অ-মুসলমানদের জমি জায়গা, ধনদৌলত ও স্ত্রীলোকদের কেড়ে নেওয়াকে বৈধ খোষণা করলেন এবং ঐসব গনিমত বা লুঠের মালের এক-পঞ্চমাংশ পবিত্র 'খুম' হিসাবে নবীর প্রাপ্য বলে ঘোষণা করে নবীর বৈষয়িক উন্নতি ঘটাতে শুরু করলেন। উপরন্তু, বিধর্মীদের কাছ থেকে, শুধু ভয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করা সম্পদের পুরোটাই নবীর প্রাপ্য বলে ঘোষণা করে তাঁর বৈষয়িক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করলেন।

অপরদিকে আল্লা সুন্দরী রমণীতে নবীর হারেম পরিপূর্ণ করার নির্দেশ পাঠাতে থাকলেন। সাধারণ মুসলমানের জন্য তিনি চারজন বিবি মঞ্জুর করেছেন, কিন্তু নবীর জন্য সেরকম কোন সীমারেখা রাখলেন না। যেসব রমণীকে তিনি সাধারণ মুসলমানের জন্য অবৈধ করেছেন, নবীর জন্য তাও বৈধ ঘোষণা করলেন। আল্লা বললেন, "হে নবী, আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাদের তুমি দেন মোহর দান করেছ এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসীগণকে যাদের আমি দান করেছি এবং বিয়ের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো ভগিনী ও ফুফুতো ভগিনী, মামাতো ভগিনী ও খালাতো ভগিনী যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে, এবং কোন বিশ্বাসী নারী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও বৈধ; এই বিশেষ ব্যবস্থা শুধু তোমার জন্য, অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়" (৩৩/৫০)। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, কোরানের এই সমস্ত আয়াতও, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে দুনিয়াব্যাপী সমগ্র মুসলিম জগৎ, স্বয়ং আল্লার বাণী বলে দিনরাত ভক্তিভরে আবৃত্তি করে চলেছে।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে যায়েদ জয়নবকে তালাক দিয়ে দিয়েছে। ইদ্দৎ বা তালাকের পরবর্তী বিধিসম্মত অপেক্ষার সময় (যুবতী রমণীদের ক্ষেত্রে যা এক ঋতুকাল, কোরান-২/২২৮) উত্তীর্ণ হলে মহম্মদ তাঁকে সপ্তম স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে হারেমে নিয়ে এলেন। হিজরীর ৫ম বছরে এই বিবাহসুসম্পন্ন হয় এবং নবীর বয়স তখন ৫৮ ও জয়নবের ৩৫ বছর। তৎকালীন আরবসমাজ, যে সমাজ বিধবা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিয়ে করতে অভ্যস্ত ছিল, সে সমাজের পক্ষেও মহম্মদ ও তাঁর পুত্রবধূ স্থানীয় জয়নবের এ বিবাহ মেনে নেওয়া কষ্টকর হল। এমনকি, মহম্মদের কিছু অনুগত অনুচরও এ নিয়ে কুৎসা শুরু করে দিল। কিন্তু আল্লা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে এই বিয়েকে সমর্থন জানালেন এবং সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটালেন। আল্লা বললেন, "অতঃপর যায়েদ যখন জয়নবের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলাম, যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করায় বিশ্বাসীদের জন্য কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লার আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে" (৩৩/৩৭)। "আল্লা নবীর জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যেসব নবী অতীত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লার বিধান। আল্লার বিধান সুনির্ধারিত" (৩৩/৩৮)।

উপরের আয়াতগুলি পড়লে মনে হয় যে, কোন বিশ্বাসীর পোষ্যপুত্র তার স্ত্রীকে তালাক দিলে সেই বিশ্বাসী তাকে বিয়ে করতে পারবে কি পারবে না, এই গুরুতর সামাজিক সমস্যা নিয়ে আল্লা যারপরনাই চিন্তিত ও বিব্রত ছিলেন। মহম্মদের সঙ্গে জয়নবের বিয়ে দিয়ে আল্লা নিজেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববাসীকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, এতে কোন দোষ নেই। এই পুণ্যের কাজ বিশ্বাসীরা ঘরে ঘরে করতে শুরু করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিতে আল্লার রসুলকে লোক নিন্দা উপেক্ষা করে কত কষ্টই না করতে হয়েছে। সৈয়দ আমির আলি নবীর বিবাহগুলির পিছনে অনেক মহৎ কারণ হাজির করেছেন ঠিকই। তবে লোকশিক্ষার এই মহৎ কারণটা তাঁর চোখে পড়েনি।

কিন্তু আল্লা হয়ত বুঝতে পারলেন যে, শুধু লোকশিক্ষার যুক্তিটা ততটা জোরালো হচ্ছে না এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, সমস্ত লোকশিক্ষার মূলোৎপাটন তখনই সম্ভব যদি পোষ্যপুত্র ব্যাপারটাকেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। সর্বজ্ঞ আল্লা তাই সেই দিকেই অগ্রসর হলেন এবং বললেন, "আল্লা কোন মানুষের দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি, তোমরা তোমাদের পত্নীগণের মধ্যে যাদের মা বলে সম্বোধন করেছো (পত্নীকে মা বলে সম্বোধন করে বর্জন করার অভিনব রীতির কথা আগেই বলা হয়েছে) তাদেরকে (আল্লা) তোমাদের মা করেননি। এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদের তোমাদের পুত্র করেননি। এসব তোমাদের মৌখিক বাক্যমাত্র এবং একমাত্র আল্লাই সত্য কথা বলেন এবং সরল পথ নির্দেশ করেন" (৩৩/৪)। আল্লা আরও বললেন, "তোমরা ওদেরকে ওদের পিতৃপরিচয়ে ডাক, আল্লার দৃষ্টিতে ইহাই ন্যায়সঙ্গত" (৩৩/৫)। সেই থেকে যায়েদকে যায়েদ বিন্ মহম্মদ নামে ডাকা বন্ধ হয়ে গেল এবং তার প্রকৃত পিতৃ পরিচয় অনুসারে যায়েদ বিন হারিস নামে ডাকা চালু হল। তবে সুখের কথা হল, আল্লা শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত থেকেছেন। যায়েদকে গর্দানে আঘাত করার বা তাকে শূলবিদ্ধ করার কোন আয়াত অবতীর্ণ করেননি। করলে সেক্ষেত্রে আল্লার আদেশ পালন না করে কোন উপায় ছিল না।

এই বিয়ে উপলক্ষ্যে নবী এক ভোজের আয়োজন করেন এবং তাতে ৩০০ লোক নিমন্ত্রিত হয়। ভোজনপর্ব চুকে গেলে নবী জয়নবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর ৩/৪ জন অনুচর তখনও গল্পগুজবে মশগুল রয়েছে। আল্লা নবীর মনে কষ্ট অনুধাবন করে সঙ্গে সঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের আহ্বান করলে নবীগৃহে প্রবেশ করবে এবং ভোজন শেষ হলে চলে যাবে; কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেও না, কারণ তা নবীর নিকট কষ্টদায়ক। সে তোমাদের চলে যেতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করে" (৩৩/৫৩)। এই আয়াতটি পড়লে বোঝা যায় যে, নবীর দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের ব্যাপারেও আল্লা কতটা খোঁজখবর রাখতেন এবং কত তৎপরতার সঙ্গে আয়াত অবতীর্ণ করতেন। কোরান হল আল্লার পঠিত প্রত্যাদেশ বা ওহীয়ে মৎলু। বর্তমান কোরানে যা আছে তা সবই আল্লা তাঁর স্বর্গীয় কোরানে আগে থেকে লিখে রেখেছিলেন। ফেরেস্তা জিব্রাইল স্বর্গ থেকে সেই স্বর্গীয় কোরান সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন এবং মহম্মদের সামনে পাঠ করতেন, আর এভাবেই কোরানের বাণী অবতীর্ণ হত। কাজেই আল্লার সর্বজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার কথা ভাবতে গেলে সত্যিই অবাক হতে হয়। এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার আয়াতও আল্লা তাঁর স্বর্গীয় কোরানে লিখে রেখেছিলেন। কেউ যদি মনে করেন যে, এইসব লিখে আল্লা তাঁর স্বর্গীয় কোরানের মহামূল্যবান পৃষ্ঠা বাজে খরচ করেছেন তবে তা হবে অত্যন্ত মূর্খামি।কারণ আল্লা সকলের উপরে এবং তাঁর দোষক্রুটি ধরা মানুষের আওতার বাইরে। ঐ সমস্ত কাফেরদের জন্য তিনি বহু আগেই গর্দানে আঘাত করার বাণী অবতীর্ণ করে রেখেছেন।

এখানে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বর্গে যেতে ৫০০ বছর ও ফিরে আসতে ৫০০ বছর লাগে। মক্কার বর্তমান কাবাগৃহের ঠিক উপরেই আছে স্বর্গীয় উপাসনালয় বা বায়তুল মামুর। ঐ বায়তুল মামুর থেকে একটা ওলন দড়ি ঝুলিয়ে দিলে তা অবশ্যই মক্কার কাবায় ঠেকবে এবং ঐ দড়ি বেয়ে কেউ উঠতে আরম্ভ করলে ৫০০ বছরে স্বর্গে পৌঁছে যাবে। কিন্তু লক্ষ ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তা জিব্রাইল দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেন। সাধারণত এই নিয়ম ছিল যে, জিব্রাইল স্বর্গীয় কোরান সঙ্গে করে ভোরবেলা স্বর্গ থেকে রওনা দিতেন এবং সন্ধ্যাবেলা মক্কা বা মদিনায় পৌঁছুতেন। তারপর মহম্মদকে স্বর্গীয় কোরান থেকে পড়ে শুনিয়ে রাত্রে আবার পৃথিবী থেকে রওনা দিতেন এবং পরদিন ভোরবেলা স্বর্গে পৌঁছুতেন। কাজেই পৃথিবীতে কোন ঘটনা ঘটলে ১২ ঘণ্টার আগে সেই সম্পর্কিত কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না।তাই ওই আয়াতের টীকা হিসাবে শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন লিখছেন যে, এর একটু পরেই সবাই চলে যায় এবং নবীর বাড়ী খালি হয়ে যায়। শুধু মহম্মদের আর এক অনুচর ওন্স তখনও সেখানে ছিল। ইতিমধ্যে মহম্মদ জয়নবের ঘরে ঢুকে পড়েন। ওন্সের ইচ্ছা ছিল যে, সেও নবীর ঘরে ঢোকে। কিন্তু নবী ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন, আর ঠিক সেই সময়ই উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আরও একটা ব্যাপার হল, ইসলামি শাস্ত্রমতে আকাশ কঠিন পদার্থ। আল্লা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী বলেই ছাদরূপী ঐ আকাশকে কোন স্তম্ভ ছাড়াই পৃথিবীর উপর স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। কেয়ামত বা শেষ

বিচারের দিন আল্লা ছাদরূপী ঐ আকাশকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবেন এবং সেই ধুলো পৃথিবীতে এসে পড়বে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, ফেরেস্তা জিব্রাইল কীভাবে ঐ ছাদরূপী আকাশকে ভেদ করে স্বর্গে মর্ত্যে যাতায়াত করতেন? কোন বিশেষ জায়গায় আল্লা কোন ফুটো করে রেখেছেন কিনা, ইসলামী শাস্ত্র থেকে জানা যায় না। উপরন্তু আজকের বিজ্ঞানীরা বিশ্বের ব্যাপ্তি যা অনুমান করেন সেই হিসাবে মক্কার কাবাগৃহ থেকে রায়তুল মামুরের দূরত্ব হওয়া উচিত কমপক্ষে ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ। কাজেই আজকের হিসাবে সেই ওলন দড়ি তৈরী করতে কত লম্বা দড়ি লাগবে এবং সেই দড়ি বেয়ে একজন বিশ্বাসীর স্বর্গে যেতে কত বছর সময় লাগবে, তা ভাবতে গেলে যেকোন লোকের অবশ্যই মাথা খারাপ হবার উপক্রম হবে। সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারেও ঘোরতর সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, আজকের দিনে ঐ দূরত্ব ফেরেস্তা জিব্রাইলের পক্ষে ১২ ঘণ্টায় অতিক্রম করা সম্ভব কিনা!

সাফোয়ান বিন মোয়াত্তেল ও বিবি আয়েশার ঘটনা

যে বছর মহম্মদ জয়নবকে বিয়ে করলেন, সেই বছরই, অর্থাৎ হিজরীর ৫ম বছরে তাঁর কানে এল যে, মক্কার কোরেশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করছে। তিনি আরও খবর পেলেন যে মুস্তালিক নামে একটি গোষ্ঠীর ইহুদিরা দলপতি হারিসের নেতৃত্বে মক্কার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর মহম্মদ বনি মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে অভিযান করবেন স্থির করলেন। নবীর মদিনাবাসকালে মুসলমানরা দশ বছরের মধ্যে মোট ৮২টি যুদ্ধ, আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালায়। এর মধ্যে ২৬টাকে বলে গাজোয়াৎ এবং বাদবাকীগুলোকে বলে সরিয়া। গাজোয়াৎ হল সেই সমস্ত যুদ্ধাভিযান যাতে স্বয়ং নবী অংশগ্রহণ করেছিলেন।বনি মুস্তালিকদের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত অভিযানকালেই এমন একটা ঘটনা ঘটে যাতে নবীর পারিবারিক ও মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হারেমের সুরক্ষার ব্যাপারেও নবীকে চিন্তিত করে তোলে।

নবী যখন কোন অভিযানে যেতেন তখন সাধারণত একজন স্ত্রীকে সঙ্গে নিতেন। কিন্তু উপরিউক্ত অভিযানের সময় বিবি উম্মে সালামার সাথে বিবি আয়েশাও নবীর সঙ্গী হলেন। পর্দা দিয়ে ঘেরা একটা বিশেষ আসনে বসে নবীপত্নীরা উটের পিঠে সওয়ার হতেন। বিবিরা আগেই ঐ বিশেষ আসনে বসে থাকতেন এবং চাকর বাকরেরা আসন সুদ্ধ তাঁদের তুলে নিয়ে উটের পিঠে চাপিয়ে দিত। অভিযান শেষ করে কাফেলা যখন মদিনায় পৌঁছাল তখন দেখা গেল যে বিবি আয়েশা তাঁর আসনে বা হাওদায় নেই। মুহূর্তের মধ্যে এক হুলুস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। বিবি আয়েশা ছিলেন একটু রোগা পাতলা ও হালকা।এই কারণ দেখিয়ে চাকর বাকররা বলল যে, আগের দিন তারা যখন বিবি আয়েশার হাওদা উটের পিঠে তুলছিল তখন তার মধ্যে বিবি আয়েশা ছিলেন কিনা বুঝতে পারেনি। চারিদিকে লোকজন পাঠিয়ে যখন খবর আনার প্রস্তুতি চলছে এমন সময় দূরে দেখা গেল সাফোয়ান বিন মোয়াত্তেল নামে এক ব্যক্তি লাগাম ধরে একটা উটকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে এবং তার পিঠে বসে আছেন বিবি আয়েশা।

বিবি আয়েশাকে দলছুট হবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে, আগের দিন রওনা দেবার ঠিক আগে প্রাকৃতিক কারণে তিনি তাঁবুর বাইরে যান, কিন্তু ফিরে এসে দেখেন যে তার গলার হারটি কোথায় ফেলে এসেছেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি আবার হার খুঁজতে বেরিয়ে যান এবং ফিরে এসে দেখেন যে তাঁকে রেখে সবাই চলে গেছে। তখন তিনি সেখানে বসেই ভাবতে থাকেন যে, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আসবে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। অপরদিকে, অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন সাফোয়ান প্রধান কাফেলার পিছন পিছন আসছিল এবং ভোরবেলা সে ঐ স্থানে পৌঁছায় ও বিবি আয়েশাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। সাফোয়ান বিবি আয়েশাকে চিনতে পেরেছিল, কারণ পর্দা চালু হবার আগে সে বিবি আয়েশাকে দেখেছিল।

এই ব্যাপারে মুসলিম লেখিকা শ্রীমতী আয়েশা আহমেদ-এর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। বানু

মুস্তালিকদের সঙ্গে জিহাদ শেষ হলে যে গনিমতের মাল পাওয়া গেল তার মধ্য থেকে মহম্মদ সর্বাপেক্ষা সুন্দরী কুমারী জয়েরিয়াকে নিজের জন্য পছন্দ করলেন এবং তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে এলেন। জয়েরিয়াকে ধর্ষণ করতে মুহম্মদের আর তর সইছিল না। কিন্তু আয়েশা তাঁবুতে বসে থাকায় নবী তাঁর কামনা পূরণ করতে পারছিলেন না। নবী দু তিন বার আয়েশাকে তাঁবু থেকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু আয়েশা তাতে কর্ণপাত করলেন না। ফলে নবী অত্যন্ত রেগে গেলেন এবং লাথি মেরে আয়েশাকে তাঁবু থেকে বার করে দিলেন। আয়েশা সঙ্গে সঙ্গে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেন বলে ঠিক করলেন এবং ইচ্ছা করেই কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে সাফোয়ান বিন মোয়াত্তেল-এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

যাই হোক, উপরিউক্ত ঘটনা লোকসমাজে এক বিরাট কুৎসার সূচনা করল। মদিনার বিখ্যাত কবি জঘন্যতম কবিতা লিখে আগুন জ্বালিয়ে তুলল। সে প্রচার করতে শুরু করল যে, সাফোয়ানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই ইচ্ছাকৃতভাবে বিবি আয়েশা কাফেলা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সে আরও প্রচার করল যে, মহম্মদের খুড়তুতো ভাই আলি এবং মহম্মদের আরও কতিপয় অনুচরের সাথে বিবি আয়েশার অবৈধ সম্পর্ক আছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবদুল্লা বিন ওব্বা, যায়েদ বিন রেফা, হাসান বিন সাবিত ইত্যাদি মহম্মদের বিশ্বস্ত অনুচরেরা, বিবি জয়নবের বোন হামনা, এমনকি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় অনুচর, বদর যুদ্ধে যোগদানকারী এবং আবু বকরের মাসতুতো ভাই হজরৎ মেসতাও এই কুৎসায় যোগ দিল। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত মহম্মদ ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। প্রথমে সবাইকে আশি ঘা করে বেত মারা হল, কিন্তু সমস্যার কিছু সুরাহা হল না। কিন্তু আল্লা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সত্বর প্রতিকারের কাজে নেমে পড়লেন।

প্রথমে তিনি একাধারে ২৪টি আয়াত (সুরা "নূর"-এর প্রথমদিকে) অবতীর্ণ করে বিবি আয়েশাকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করলেন। বিবি আয়েশা যে নিষ্কলুষ তা আরও ভালোভাবে প্রমাণিত হল, যখন আবিষ্কার করা গেল যে সাফোয়ান নপুংসক ছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, মহম্মদ তাঁর দাসীপত্নী মারিয়াকে একটা বাগানবাড়ী তৈরী করে সেখানে রেখেছিলেন এবং একজন চাকর সেখানে মারিয়ার দেখাশুনা করত। একদিন মহম্মদের কানে এল যে, ঐ চাকর মারিয়ার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। চাচাতো ভাই আলি সঙ্গে সঙ্গে সরেজমিনে ঘটনার তদন্ত করতে গেল। চাকরটা তখন কুয়োর পাশে স্নান করছিল। আলি তরোয়াল দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঐ চাকরের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলল।

যাই হোক, এর পর আল্লা আরও বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যার কতগুলি নবীপত্নীদের উদ্দেশ্য করে এবং বাকীগুলি, যারা নবীপত্নীদের প্রতি কুৎসিত দৃষ্টি দেয় তাদের উদ্দেশ্য করে। আল্লার বুঝতে বাকী থাকল না যে পর্দাকে আরও কঠোর করে নবীর হারেমকে নিশ্ছিদ্রভাবে সুরক্ষিত করা একান্ত জরুরী। নবী সমস্ত মুসলমানদের নেতা, তাই তাঁর বাড়ীতে অনুচরেরা যাতায়াত করবেই এবং সেটাই সবথেকে বিপজ্জনক ব্যাপার। পরপুরুষের সাথে খোলামেলাভাবে নবীপত্নীদের মিশতে দিলে কী কাণ্ড ঘটতে পারে, জয়নবের ব্যাপার থেকেই আল্লা তা টের পেয়েছেন। তাই আল্লা বললেন, "হে নবীপত্নীগণ, যে কাজ স্পষ্টতই অশ্লীল তোমাদের মধ্যে কেউ তা করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে" (৩৩/৩০)। আল্লা আরও বললেন, "হে নবীপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সদালাপ করবে এবং গৃহে অবস্থান করবে, প্রাক্-ইসলামী যুগের মতো নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়িও না" (৩৩/৩২-৩৩)। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লা নবীপত্নীদের গৃহে অবস্থান করার পরামর্শ দিয়ে মুসলমানদের পক্ষে মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখাকে বৈধ করে দিচ্ছেন এবং দ্বিতীয়তঃ "প্রাক্-ইসলামী...প্রদর্শন করে বেড়িও না" বাণীর দ্বারা প্রমাণ করে দিচ্ছেন যে, প্রাক্-ইসলামী আরবে পর্দাও ছিল না এবং মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় কোন বিধিনিষেধও ছিল না।

অন্যান্য বান্দাদের শাসন করার জন্য আল্লা বললেন, "আল্লা ও তার ফেরেস্তাগণ নবীকে অনুগ্রহ করেন, তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর, যারা আল্লা সম্বন্ধে মন্দ বলে ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয় আল্লা তাদের ইহলোক পরলোক অভিশপ্ত করেন এবং তিনি

তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন" (৩৩/৫৬-৫৭)। এরপরই এল সেই ভয়ঙ্কর আয়াত, "কপটচারীগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব।...অভিশপ্ত হয়ে ওদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে" (৩৩/৬০-৬১)। এই আয়াতটি নবীর বিরুদ্ধে কুৎসাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেবার মূল ইসলামী বিধান।

তৎকালীন আরবে বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে কোনরকম বিধিনিষেধ ছিল না। তাই স্বাভাবিকভাবেই নবীর কিছু কিছু অনুচর মনে মনে এই আশা পোষণ করত যে, মহম্মদের মৃত্যুর পর তারা তাঁর যুবতী বিধবাদের বিয়ে করবে। কিন্তু আল্লা নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করে সে আশার মূলোৎপাটন করলেন। আল্লা বললেন, "আল্লার রসুলকে কষ্ট দেওয়া বা তাঁর অবর্তমানে তাঁর পত্নীদের বিবাহ করা তোমাদের পক্ষে উচিত নয়" (৩৩/৫৩)। "নবী বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতাস্বরূপ" (৩৩/৬)। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। খলিফা ওমরের সময় আসাদ বিন কাইম নামে এক ব্যক্তি কোন এক রমণীকে বিবাহ করে। কিন্তু ঐ রমণীকে কেন্দ্র করে এই জনরব ওঠে যে, বিয়ে না করলেও কোন এক সময় নবী ঐ রমণীতে গমন করেছিলেন।ওমর যখন আসাদকে রজমে দণ্ডিত করার কথা ভাবছিলেন তখন অনুসন্ধান করে জানা গেল ঐ গুজব সত্য নয়। কোন একসময় ঐ মহিলা নিজেকে নবীর কাছে নিবেদন করেছিল ঠিকই, কিন্তু নবী তা গ্রহণ করেননি।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে যে, প্রথমদিকে মুসলমান নারীকে অ-মুসলমান নারীদের থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে যে পর্দা চালু হয়েছিল, কালক্রম, প্রধানত নবীর নিজস্ব হারেম সুরক্ষিত করতে তা এক কঠিন সামাজিক অনুশাসনে পরিণত করা জরুরী হয়ে ওঠে। তাই আল্লা বললেন, "(হে নবী) বিশ্বাসী নারীদের বল যে, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ করে থাকে তা ছাড়া তাদের অন্য আভরণ যেন প্রকাশ না করে। তাদের বক্ষ ও গ্রীবা যেন মাথার কাপড় (ওড়না) দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতার পুত্র, ভগ্নীর পুত্র, সেবিকা, যারা তাদের অধিকারভুক্ত ও অনুগত, যৌন-কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীগণের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো কাছে তাদের আভরণ প্রকাশ না করে; তারা যেন গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে" (২৪/৩১)। "নবীপত্নীদের জন্য তাদের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগিনীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীগণের ব্যাপারে এ (পর্দা) পালন না করা অপরাধ নয়" (৩৩/৫৫)।

বিশেষজ্ঞদের মতে উপরিউক্ত আয়াতগুলিতে আল্লা আভরণ বলতে অলঙ্কার ইত্যাদির সঙ্গে শরীরের যে সমস্ত অংশ সাধারণত দেখানো উচিত নয় তাও বোঝাতে চাইছেন। বিশেষ করে নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ স্বামী ছাড়া আর কাউকেই দেখানো একেবারে নিষিদ্ধ। যেসব পুরুষকে পর্দার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের বলা হয় মাহারাম ব্যক্তি। এই মাহারাম ব্যক্তিরা খুবই নিকট আত্মীয় পুরুষ এবং এদের কাছ থেকে কোনরকম ভয়ের কারণ নেই, কারণ কোরানে এইসব ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন প্রকাশ্যে সাক্ষ্যদেবার সময় কিংবা ডাক্তার কবিরাজের সামনে পর্দা অমান্য করা চলতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, মাহারাম ব্যক্তিদের তালিকা থেকে কাকা ও মামাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই কাকা বা মামা তার ভাইঝি বা ভাগ্নীকে পর্দাবিহীন অবস্থায় দেখার যোগ্য কিনা তা বিতর্কের বিষয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মত হল, যেহেতু কাকা বা মামা তার ভাইঝি বা ভাগ্নীর শরীর তার ছেলেদের কাছে বর্ণনা করতে পারেন, তাই তাঁরা নিষেধের তালিকাতেই পড়েন। ঠিক তেমনি, কোন বিধর্মী মহিলার সামনে পর্দা করা উচিত কি উচিত নয় সেটাও বিতর্কের বিষয়, কারণ তারা তাদের পুরুষদের কাছে শরীর বর্ণনা করতে পারে। তবে বেশীরভাগের মত হল যে, যেকোন মহিলার সামনেই পর্দা অনাবৃত করা চলে। ক্রীতদাস, সে পুরুষই হোক আর মহিলাই হোক, পর্দার আওতার বাইরে বলে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, একদিন মহম্মদ তাঁর মেয়ে ফতেমাকে একটি ক্রীতদাস উপহার দিতে নিয়ে যান। ফতেমা তখন খুবই স্বল্পবাসে ছিলেন, মাথা ঢাকতে গেলে পা দেখা যাচ্ছিল, পা ঢাকতে গেলে মাথা অনাবৃত হয়ে যাচ্ছিল। ফতেমার এই অবস্থা দেখে মহম্মদ হেসে ফেললেন এবং বললেন, "পুরুষ হলেও এ একজন ক্রীতদাস মাত্র। কাজেই এর সামনে পর্দা করার দরকার নেই।" কোন কামনা রহিত পুরুষ বলতে আল্লা বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ বা হাস্যকর এমন সব পুরুষ বোঝাতে চাইছেন, যারা নারীর কাম বা পুরুষের ঈর্ষা জাগাতে অক্ষম। কিন্তু হিজরাদের সামনে পর্দা করতে হবে কি হবে না তা তর্কের

বিষয়।

কথিত আছে যে, একদিন একটা কিছু দেওয়া-নেওয়ার সময় মহম্মদের এক অনুচরের হাত বিবি আয়েশার হাতকে স্পর্শ করে। নবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এ ঘটনা তাঁর মনকে ব্যথিত করে। কাজেই আল্লা আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তোমরা বিশ্বাসীরা নবীর পত্নীদের থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইবে" (৩৩/৫৩)। পর্দা সম্বন্ধে কোরানের অনুশাসনের এটাই সম্ভবতঃ শেষ আয়াত। এর আগে আল্লা মেয়েদের গৃহে অবস্থান করতে বলেছেন। কিন্তু এই আয়াতের দ্বারা বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, শুধু গৃহে অবস্থান করাই যথেষ্ট সাবধানতা নয়। গৃহের অভ্যন্তরেও পর্দার অন্তরালে থাকতে হবে। কাজেই এই আয়াত মুসলিম মহিলাসমাজকে গৃহে নজরবন্দী বন্দিনীতে পরিণত করল।

উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় যে, প্রাক্ ইসলামী আরবসমাজে যথেচ্ছ যৌনাচারের যে রীতি প্রচলিত ছিল, বহু বিবাহ ও সহজ তালাকের মাধ্যমে ইসলাম বা কোরান তা প্রায় অবিকৃতই রেখে দিল। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, আরবের জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের জনপ্রিয়তা হারাবার আশঙ্কা। দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায় যে, মুসলিম পুরুষদের সামনে যৌন সম্ভোগের প্রলোভনকে জিইয়ে রেখে তাদের জিহাদ বা লুটপাট ও দাঙ্গার মাধ্যমে বিধর্মীর সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্য উদ্দীপিত করা। কারণ কোরানমতে যুদ্ধ বন্দী নারী গনিমত বা লুটের মাল মাত্র এবং তাদের সঙ্গে যৌন সম্ভোগ সর্বদাই বৈধ। উপরন্তু ইসলাম মুসলমান পুরুষদের হাতে তুলে দিল নারী জাতিকে দমন করে রাখার একটা শক্তিশালী অস্ত্র, পর্দা।

অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা চার-এ বেঁধে দিয়ে বিশাল বিশাল হারেম তৈরী করার প্রচেষ্টাকে বন্ধ করেছে এবং এইভাবে নারীজাতিকে সম্মানিত করেছে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সহজ তালাকের ব্যবস্থা থাকায় হারেম তৈরী করতে যাওয়াটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যে ব্যবসায় মাল আসার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী করে দেবার সুযোগ আছে, সকলেই স্বীকার করবেন যে, সে ব্যবসায় গুদামের প্রয়োজন হয় না। নবীর নাতি হজরত হাসান, যাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিয়াপন্থী মুসলমানরা শোকের উৎসব মহরম পালন করেন, এ ব্যবসায় খুব হাত পাকিয়েছিলেন। তিনি এক দরজা দিয়ে নতুন বিবি নিয়ে আসতেন এবং অন্য দরজা দিয়ে আগের বিবিদের তালাক দিয়ে বিদায় করতেন। বিবির সংখ্যা বাড়িয়ে আল্লার নির্দেশ অমান্য করতেন না। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এভাবে ৭০ জন (মতান্তরে ৯০ জন) বিবিকে তালাক দেন। এজন্য তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল তালাকের খলিফা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, পর্দা একটি কঠিন সামাজিক রীতি হয়ে ওঠার মূলে বিবি আয়েশার দান অনেকখানি। বিবি আয়েশাকে ঘিরেই সমস্ত রকম কুৎসার সূত্রপাত এবং প্রধানত তাঁর সাথে নবীর অনুচরদের মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতাকে রোধ করার উদ্দেশ্যেই পর্দা কঠিন অনুশাসনে পরিণত হয়।কাজেই বলা চলে যে, বিবি আয়েশার সাথে নবীর বিবাহ না হলে পর্দা তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য সাধনের মধ্যেই, অর্থাৎ মুসলমান নারীকে অ-মুসলমান নারী থেকে পৃথক করার মধ্যেই সীমিত থাকত। কিন্তু শুধু বিবি আয়েশাকে রক্ষা করতে গিয়ে নবীর অন্যান্য পত্নীগণ সহ সমগ্র মুসলীম নারীসমাজ পর্দায় আবৃত হয়ে গেল।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, পর্দা এই সমসাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েই শেষ হয়ে গেল না। বিবি আয়েশা বা নবীর মৃত্যুর সাথে পর্দা লুপ্ত হয়ে গেল না, বরং অনাদিকালের জন্য মুসলিম নারীসমাজের মাথায় জগদ্দল পাথরের মতোই চেপে বসল। কারণ যা একবার কোরানে লেখা হয়ে গেল তার আর পরিবর্তনের কোন উপায় নেই।ইসলামের ছয়টি কলেমা বা সংকল্প-বাক্যের মধ্যে চতুর্থ কলেমা, 'কলেমা তামজিদ্' বলছে যে, হজরৎ মহম্মদ নবীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ও শেষ নবী। এখানে 'শেষ নবী' কথার তাৎপর্য হল এই যে, মানবজাতিকে আল্লাতায়লার যা কিছু বলার ছিল তা সবই নবী মহম্মদ ও আসমানী কেতাব কোরানের মাধ্যমে বলা হয়ে গেছে। তাই ভবিষ্যতে আর কোন নবীও জন্মাবেন না এবং কোরানের বাণীরও কোন হেরফের হবে না।

পরবর্তীকালে মুসলমানরা তরবারির জোরে এমন অনেক দেশ জয় করল যেসব দেশের সভ্যতা ও

সংস্কৃতি ছিল পশুপালক ও যাযাবর আরব বেদুইনদের থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু সেখানেও তারা, ধর্মের নামে, গায়ের জোরে কোরানের সমস্ত মধ্যযুগীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতি সেইসব দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে লাগল। এবং মুসলমান হওয়ার মধ্য দিয়ে তারাও নিজেদের উন্নত সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে একটা যাযাবর পশুপালকের সংস্কৃতিতে ফিরে গেল। যে সমাজে নারী অনেক সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিল, সেখান থেকে তাকে টেনে নামানো হল এবং পর্দায় আবৃত করে পুরুষের একটা অস্থাবর সম্পত্তি ও ভোগ্য বস্তুতে পরিণত করা হল। যে সমাজে পর্দার কোন প্রয়োজন ছিল না, যে সমাজে নারী মাতৃজাতি হিসাবে সম্মানিত হত, ইসলামের দ্বারা সে সমাজকে কলুষিত করা হল এবং নারীকে পর্দাবৃত করা হল।

বর্তমান বিশ্বে একমাত্র ইসলামি দেশগুলোতেই কোন পুরুষের পক্ষে একাধিক বিয়ে করে হারেম তৈরী করা আইনতঃ সিদ্ধ এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী স্বীকৃত। তবে একমাত্র বিত্তশালীদের পক্ষেই তা সম্ভব, আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শ্রেণী তা পারে এবং তারা হল ধর্মগুরু বা মোল্লাশ্রেণী। বলতে বাধা নেই যে, ধর্মের নামে হারেম সৃষ্টি করে যথেচ্ছ যৌনাচারের প্রলোভনই দুনিয়াব্যাপী মোল্লা শ্রেণীকে ইসলামি রাষ্ট্র গঠন করে শরীয়তি আইন চালু করার জন্য ইন্ধন যোগাচ্ছে।

কিন্তু তাদের এই হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথে প্রধান অন্তরায় হল মুসলিম নারীসমাজ। যদি তারা শিক্ষার আলো পায়, আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে এবং সর্বোপরি প্রতিবাদ করার শক্তি অর্জন করে তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাই ইসলামী আইনের প্রথম খড়্গ নেমে আসে নারীসমাজের উপর। সবার আগে তাদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দাও, ঘরে নজরবন্দী করে রাখ এবং শিক্ষার আলো তাদের কাছে পৌঁছুতে দিও না। সবদিক দিয়ে তাদের পুরুষের উপর নির্ভরশীল করে রাখ যাতে যে কোন সময় বিবাহ করে লালসা চরিতার্থ করা যায় এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বা বিরূদ্ধাচরণ করলে খুব সহজেই তালাক দিয়ে বিদায় করা যায়। এই বর্বর অত্যাচার তারা যেন চিরকাল মুখ বুজে সহ্য করে।

তাই মুসলীম নারীসমাজকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের পক্ষে চূড়ান্ত অবমাননাকর পুরুষের বহু বিবাহ ও সহজ তালাকের প্রথা এবং পর্দার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। পর্দা যে শুধু তাদেরই অশিক্ষিতা ও অনগ্রসর করে রাখছে এটা ভাবাও হবে এক মারাত্মক ভুল। কারণ মা অনগ্রসর ও অশিক্ষিত থাকলে তার সন্তান-সন্ততিরও একই পরিণতি হতে বাধ্য। তাই মোল্লাতন্ত্রের হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করে তাদের পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে এবং শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্বে একটি প্রগতিশীল নারীসমাজ হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

— ১। কোরআন শরীফ, ড. ওসমান গনি

— ২। কোরআন শরীফ, শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন, হরফ

— ৩। The Koran, George Sale

— ৪। Sahih Muslim (4 Vols), Abdul Hamid Siddqui

— ৫। Understanding Islam Through Hadis, Ram Swarup

— ৬। হাদিস শরীফ, রফিক উল্লাহ্, হরফ

— ৭। কাবার পথে (২ খণ্ড), আবদুল আজীজ আল আমান, হরফ

— ৮। মুসলিম পঞ্জিকা (১৪০০ বঙ্গাব্দ), (হরফ)

— ৯। কোরআনে নবীদের ইতিহাস, সাইয়্যেদা কানিজ মুস্তাফা

— ১০। নবীদের জীবনসঙ্গিনী, এম. আবদুর রহমান

— ১১। Life of Mahomet, Sir William Muir, Voice of India

— ১২। Mohammad Encyclopaedia of Seerah (3 Vols), Seerah Foundation, London

— ১৩। New Light on the Life of Mahomet, A. Guillaume

— ১৪। Life and Times of Mohammad, Sir John Bagot Glubb

— ১৫। Spirit of Islam, Sir Syed Amir Ali

— ১৬। Dictionary of Islam, T. P. Hughes.

— ১৭। The Origin of Islamic State, P. K. Hitti

— ১৮। The Holy Bible, International Bible Society, U.S.A

— ১৯। A Short History of the World, Sir H. G. Wells, Penguin

— ২০। The Cultural Heritage of India (Vols. I & VI), R.K.M. Institute of Culture

— ২১। ঋগ্বেদ সংহিতা (২ খণ্ড), হরফ)

— ২২। শ্রীগীতা, শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ

— ২৩। উপনিষদ গ্রন্থাবলী (৩ খণ্ড), উদ্বোধন)

— ২৪। হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব, শ্রী দুর্গাদাস বসু

— ২৫। সরল সাংখ্যযোগ, স্বামী হরিহরানন্দ, আনন্দ

— ২৬। যোগকারিকা (পাতঞ্জল যোগ), স্বামী হরিহরানন্দ, আনন্দ

— ২৭। Hindu Economics, M. G. Bokare

— ২৮। লজ্জা, তসলিমা নাসরিন